কাদিয়ানী সম্প্রদায়
তত্ত্ব ও ইতিহাস

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

কাদিয়ানী সম্প্রদায়
তত্ত্ব ও ইতিহাস

হযরত আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদ : জুবাইর আহমদ আশরাফ

প্রকাশক
আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে নবুওয়ত
২/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

কাদিয়ানী সম্প্রদায় : তত্ত্ব ও ইতিহাস

মূল : হযরত আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদ : জুবাইর আহমদ আশরাফ

প্রকাশকাল
রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরি
মার্চ ২০০৮ ইংরেজি

প্রকাশক
আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে নবুওয়ত
২/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

হাদিয়া : ১১০.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
মদীনা পাবলিকেশান্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা
সাউদিয়া কুতুবখানা
৬০, চকবাজার, ঢাকা
সাউদিয়া লাইব্রেরী
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা

QUADINAYS SOMPRODAY : Written by Abul Hassan Ali Nadwi, Translated in Bangla, Jobair Ahmed Ashraf and Published by Majlis-e-Tahaffuje Khatme Nobuot, 2/2 Purana Palton, Dhaka, March-2008
Price : 110 Tk.

অভিমত

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا

উপমহাদেশে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব মুসলিম উম্মাহর জন্য ক্যান্সারস্বরূপ। স্বার্থপর বৃটিশ সরকার তাদের আধিপত্য পাকাপোক্ত করা এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে পূর্ব পাঞ্জাবের কাদিয়ানের অধিবাসী মির্যা গোলাম আহমদকে মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার বানিয়ে দাঁড় করায়। সে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় অতি কৌশলে পর্যায়ক্রমে তার উক্ত দাবী প্রচারের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক সরলপ্রাণ মুসলমানকে পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে সচেতন ওলামা ও বিজ্ঞ মুসলমান এই 'ভণ্ড নবীর' মিথ্যা নবুয়তের দাবীর প্রতিবাদে প্রথম থেকেই সোচ্চার ছিলেন। কিন্তু খ্রিষ্টান, ইহুদী ও ইসলামের অন্যান্য দুশমন শক্তির ছত্রছায়ায় ক্রমান্বয়ে তার একটি বিশেষ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। যদিও বিশ্বের ওলামা এবং অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র তাদের কাফের ও মুরতাদ বলে ফতওয়া দিয়েছেন, তবুও তাদের ষড়যন্ত্রমূলক প্রচার অভিযানে বহু সরলপ্রাণ মুসলমান বিভ্রান্ত হচ্ছে। আমাদের দেশেও তাদের অপতৎপরতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (জন্ম ১৮৪০-মৃত্যু-১৯০৮)-এর আসল পরিচয় এবং প্রকৃত স্বরূপ জানার পর কোনো বিবেকবান ও ঈমানদার ব্যক্তি তাকে নবী স্বীকার করা দূরের কথা, তাকে একজন ভদ্র এবং সত্যবাদী মানুষ হিসেবেও গণ্য করতে পারে না। অবশ্য তার প্রকৃত পরিচয় না জেনে ধোকার জালে পড়ে কিছু লোক তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কাজেই সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে মির্যা কাদিয়ানী এবং তার সম্প্রদায়ের প্রকৃত পরিচয় জনসম্মুখে তুলে ধরা অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে উর্দু, আরীব, ফারসী ও ইংরেজি ভাষায় ওলামায়ে কেরাম ছোট বড় বহু

গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত ও নন্দিত আলেমে দীন মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান নদবী 'কাদিয়ানিয়্যাত' নামে প্রায় দু'শ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ প্রথমে আরবী পরে উর্দু ভাষায় প্রকাশ করেন। তিনি এতে মির্যা কাদিয়ানির বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি সহকারে নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদিসহ তার পরিচয় তুলে ধরেন।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সাধারণের উপকারের উদ্দেশে মাদ্রাসা ফয়জুল উলুম আজিমপুর ঢাকার ওসতাদ, স্নেহভাজন মাওঃ জুবাইর আহমদ আশরাফ উক্ত গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ করেন এবং মজলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে নবুওয়ত বাংলাদেশ গ্রন্থখানি ছাপানোর দায়িত্ব নিয়েছে।

আশা করি এ গ্রন্থ পাঠে সকল মুসলমান মির্যা কাদিয়ানী এবং তার সম্প্রদায়ের সঠিক স্বরূপ জানতে সক্ষম হবেন এবং তাদের প্রতারণা থেকে রক্ষা পাবেন। মা উরীদু ইল্লাল ইসলাহ, মাসতাতা'তু।

উবায়দুল হক

খতীব

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম, ঢাকা

সভাপতি

আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে নবুওয়ত

অভিমত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবী প্রণীত 'কাদিয়ানিয়্যাত' উর্দু ভাষায় একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। গ্রন্থখানির বাংলা অনুবাদ আগাগোড়া পড়ে স্থানে স্থানে প্রয়োজন মত সংশোধন ও সম্পাদনা করে দিয়েছি। বইখানি বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সাধারণের জন্য 'কাদিয়ানী' দর্শন ও আদর্শ এবং তার প্রবর্তক মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর জীবনী সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব জানার একটি উৎস ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এর বিষয়বস্তু যুগোপযোগী।

গ্রন্থখানি বাংলার ধর্মপ্রাণ প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পাঠ্য বলে মনে করি। এতে আমাদের দেশের সকলের কাদিয়ানী সম্বন্ধীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর হবে। গ্রন্থখানির সাফল্য ও প্রচার কামনা করি এবং তরুণ অনুবাদককে খোশ আমদেদ জানাই।

কাজী দীন মুহম্মদ

অধ্যাপক বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ: ২২ শে অক্টোবর, ১৯৯৪

আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে নবুওয়ত
বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদকের
আহবান

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী– এ কথা পবিত্র কোরআন শরীফের ৯৯টি আয়াত এবং ২১০টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ আকীদা অস্বীকারকারী কাফের ও মুরতাদ– এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। সমগ্র বিশ্বের ওলামা মাশায়েখ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন।

উল্লিখিত খতমে নবুওয়ত আকীদার সংরক্ষণের উদ্দেশ্য গঠিত হয়েছে 'আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে নবুওয়ত বাংলাদেশ।'

সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সভা-সমিতি, সেমিনার ও মিছিল মিটিং ইত্যাদির মাধ্যমে যেমন আন্দোলনের কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে, অনুরূপভাবে প্রকাশনার মাধ্যমেও বিভিন্ন বই-পুস্তক ও লিফলেট প্রচার করে খতমে নবুওয়তের আকীদা সর্বসাধারণের নিকট পৌছে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালু রয়েছে।

ইতোপূর্বে পবিত্র কাবা শরীফের ইমাম শায়েখ সুবাইয়্যিল কর্তৃক রচিত আরবী কিতাবের বঙ্গানুবাদ "সর্বশেষ নবী" এবং মাওলানা বশীর আহমদ রচিত উর্দু কিতাবের বঙ্গানুবাদ "কাদিয়ানীরা কাফের কেন? এবং পাকিস্তানের মুলতান হতে প্রকাশিত উর্দু ভাষায় লিখিত "ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়্যাত আওর মিল্লাতে ইসলামিয়া কা মওকফ" নামক কিতাবের অনুবাদ "কাদিয়ানী ফিৎনা ও মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান" নামক ইত্যাদি বহু পুস্তক-পুস্তিকা মজলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে নবুওয়তের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।

এ কর্মসূচীর আওতায় বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী রচিত উর্দু কিতাবের বঙ্গানুবাদ "কাদিয়ানী সম্প্রদায় : তত্ত্ব ও ইতিহাস" নামে প্রকাশ করা হচ্ছে।

পাঠক পাঠিকা ভাই বোনদের প্রতি মূল্যবান গ্রন্থটি নিজে পাঠ করে অপর ভাইকে পাঠ করতে দেওয়ার জন্য এবং আকীদায়ে খতমে নবুওয়ত প্রচার করে মহানবী (সা.)-এর শাফায়াত লাভের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজে
খতমে নবুওয়ত বাংলাদেশ

কাদিয়ানী সম্প্রদায়
তত্ত্ব ও ইতিহাস

সূচিপত্র

কিছু কথা / ১৮

প্রথম অধ্যায়

কাদিয়ানী সম্প্রদায় : সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত ও কেন্দ্রীয় চরিত্র / ২২

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈসায়ী উনিশ শতকের ভারতবর্ষ / ২৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী / ২৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব ভেয়রবী / ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

মির্যা গোলাম আহমদ : বিশ্বাস ও দাবীসমূহের ক্রমধারা / ৪৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

মির্যা সাহেব : লেখক ও ইসলাম প্রচারক হিসেবে

লেখালেখি এবং বিতর্ক সভার ময়দানে / ৪৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মসীহ মওউদ হওয়ার দাবী

মির্যা সাহেব ও হাকীম সাহেবের মাঝে সম্পর্ক / ৬০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মসীহ মওউদের দাবী থেকে নবুওয়ত পর্যন্ত

একটি গোছালো চিত্র / ৭৬

তৃতীয় অধ্যায়

মির্যা সাহেবের জীবনীর উপর এক নযর / ৯১

প্রথম পরিচ্ছেদ

মির্যা সাহেবের জীবনাচার : দাওয়াতের উন্নতি ও জনসাধারণের গমনাগমন আরম্ভ হওয়ার পর মির্যা সাহেবের প্রাথমিক অবস্থা / ৯২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইংরেজদের সহযোগিতা প্রদান ও জিহাদ নিষিদ্ধ ঘোষণা / ১০১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের অভদ্রোচিত কথা ও গালিগালাজ / ১১৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা পূর্ণ হয়নি

মোহাম্মদী বেগমের সাথে বিবাহের ভবিষ্যদ্বানী / ১১৯

চতুর্থ অধ্যায়

কাদিয়ানী সম্প্রদায় : সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনা / ১২৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

এতটি স্বতন্ত্র ধর্ম ও দূরত্ব রক্ষাকারী একটি ভিন্ন সম্প্রদায় / ১৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবুওয়তে মুহাম্মদীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

খতমে নবুওয়ত আল্লাহ তায়ালার পুরস্কার এবং উম্মতে মুসলেমার বৈশিষ্ট্য / ১৪১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লাহোরী শাখা ও তাদের আকীদা / ১৫৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলিম জাহানকে কি দিয়েছে? / ১৬৯

গ্রন্থপঞ্জি / ১৭৫

অনুবাদকের পূর্বাভাষ

মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী রসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি হওয়ার কারণে তাঁরাই ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁদের মাঝে আবার শ্রেষ্ঠতম সত্তা হলেন সরওয়ারে আলম, ফখরে বনী আদম, শাফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল লিল-আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নবুওয়তের যাবতীয় গুণাবলি তাঁর মাঝে পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর মাধ্যমেই এ ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাই তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়্যীন। নবুওয়তের ধারাবাহিকতাকে যদি বিশাল সৌধের সাথে তুলনা করা হয় তবে তিনি হলেন সেই সৌধের সর্বশেষ ইট। তাঁর মাধ্যমে সৌধটি চূড়া পূর্ণতা পেয়েছে। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন : 'মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, বরং আল্লাহর রাসূল এবং শেষনবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।' (আহযাব : ৪০) এ আয়াতে 'খাতামুল মুরসালীন' না বলে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' বলা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, তাঁর পরে যেমনিভাবে নতুন শরীয়তওয়ালা কোন রসূলের আগমন ঘটবে না, তেমনি শরীয়তবিহীন কোন নবীরও আগমন ঘটবে না। তাঁর আগমনের পর কোন ধরনের নবী আসারই আর অবকাশ নেই।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দীন বা জীবনদর্শন। বিদায় হজ্জের আরাফার দিন আল্লাহ তায়ালা মহানবী (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।' (মায়িদা-৩) এর পর মহানবী (সা.) প্রায় তিন মাস জীবিত ছিলেন, কিন্তু বিধান সম্বলিত কোন আয়াত আর তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়নি। এ ঘোষণার মাধ্যমে সকল উম্মতের

উপর উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, এতে ইঙ্গিত রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতের জন্য দীনকে এরকম পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত এ দীনের মাঝে আর কোন রকম পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। কোন নতুন দীন বা নতুন নবীরও প্রয়োজন নেই। এ জন্য জনৈক ইহুদী একদিন হযরত ফারুকে আযম (রা.)-কে বলেছিল, আমীরুল মোমেনীন! তোমাদের কুরআনে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা তোমরা পড়ে থাক, এ আয়াতটি যদি আমাদের উপর অবতীর্ণ হত তবে আমরা এই অবতীর্ণ হওয়ার দিনকে উৎসব হিসেবে পালন করতাম। হযরত ফারুকে আযম (রা.) বললেন : কোন আয়াতটি? ইহুদী উত্তরে উপরের আয়াতটির কথা বলল।

ইমামুল মোফাসসেরীন আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (রহ.) উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ উম্মতের উপর আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো, তিনি তাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদী অন্য কোন দীনের মুখাপেক্ষী নয় বা অন্য কোন নবীর দিকেও মুখাপেক্ষী নয়। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা হুযূর (সা.)-কে খাতামুল আম্বিয়া বানিয়েছেন এবং তাঁকে সকল জিন ও মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন।' এখানে দুটি মাত্র আয়াত উদ্ধৃত হল। পবিত্র কুরআনে অন্ততপক্ষে একশটি আয়াত রয়েছে, যেখানে স্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে খতমে নবুওয়তের ধারণা পেশ করা হয়েছে। তেমনি রসূলে কারীম (সা.)-এর বহু হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তিনিই শেষনবী, তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত হল।

মহানবী (সা.) এরশাদ করেছেন : আল্লাহ তায়ালার নিকট সে সময়েই আমি খাতামুন নাবিয়্যীন হিসেবে নির্ধারিত হয়ে গেছি যখন আদম (আ.)-এর মাঝে রূহও দেওয়া হয়নি।– (মুসনাদে আহমদ)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : আমি তোমার উম্মতকে সবার শেষে প্রেরণ করেছি, কিন্তু তাদের হিসাব নিকাশ সবার আগে হবে। আমি নবীদের মাঝে তোমাকে সর্বাগ্রে সৃষ্টি করেছি এবং সকলের পরে প্রেরণ করেছি। তোমাকে নবুওয়তের সূচনাকারী ও খতমকারী বানিয়েছি। –(আল খাসায়েসুল কুবরা)

হযরত সালমান ফারেসী (রা.) থেকে শাফাআতের হাদীসে বর্ণিত আছে, (হাশরের ময়দানে) মানুষেরা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আসবে এবং বলবে, হে আল্লাহর নবী, আপনিই ঐ সত্তা, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা নবুওয়ত শুরু করেছেন এবং যাঁর উপর নবুওয়ত খতম করেছেন এবং আপনার সামনের ও পেছনের সব ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন।

–(ফাতহুল বারী, খ-২, পৃ-২৭৮)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন : আমার ও অন্যান্য নবীদের তুলনা এরকম, এক ব্যক্তি একটি ঘর বানিয়েছে এবং একটি ইটের জায়গা ব্যতীত ঐ ঘরটি পরিপূর্ণ করেছে। অতঃপর আমি আসলাম এবং ঐ ইটটি পরিপূর্ণ করলাম।

–(মুসলিম শরীফ)

হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর (সা.) বলেছেন : আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কুফর নিশ্চিহ্ন করবেন। আমার পর-ই কেয়ামত আসবে এবং হাশর হবে। আমার এবং কেয়ামতের মাঝে কোন নবী আসবে না।– (মুসলিম শরীফ)

হযরত ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রসূল (সা.) এরশাদ করেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশ জন মিথ্যাবাদী পয়দা হবে, তাদের প্রত্যেকেই মনে করবে, সে নবী; অথচ আমি খাতামুন নাবিয়্যীন, আমার পরে কোন নবী আসবে না।– (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন : আমি সর্বশেষ নবী, আমার মসজিদ নবীদের সর্বশেষ মসজিদ।

– (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন : হে আবু যর, প্রথম নবী আদম আর শেষনবী মুহাম্মদ। –(ইবনে হিব্বান)

হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) বলেন, হুযূর (সা.) এরশাদ করেছেন : আমি আল্লাহর বান্দা এবং খাতামুন নাবিয়্যীন।–(বায়হাকী)

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) এরশাদ করেছেন : রেসালাত এবং নবুওয়ত খতম হয়ে গেছে। আমার পর কোন রসূলও আসবে না, নবীও আসবে না। –(তিরমিযী শরীফ)

হযরত আবু উমামা আল-বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন : আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মত।–(ইবনে মাজা)

হযরত উকবা ইবন আমের (রা.) বলেন, হুযূর (সা.)-এর উভয় কাঁধের মাঝখানে মোহরে নবুওয়ত ছিল এবং তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন।

–(শামায়েলে তিরমিযী)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, হযরত রসূল (সা.) এরশাদ করেছেন : আমি সকল রসূলের ইমাম এবং এতে আমার কোন অহংকার নেই; আমি খাতামুন নাবিয়্যীন এবং এতে আমার কোন অহংকার নেই; আমি কেয়ামতের দিন প্রথম সুপারিশকারী ও আমার সুপারিশ প্রথমে কবুল করা হবে; এতেও আমার কোন অহংকার নেই।– (মিশকাত শরীফ)

হযরত তামীমে দারী (রা.) কবরের প্রশ্ন সম্পর্কে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে বলেন, মহানবী (সা.) এরশাদ করেছেন : মুনকার-নকীরের প্রশ্নের উত্তরে মুসলমান বলবে, আমার দীন ইসলাম, আমার নবী মুহাম্মদ এবং তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন। এ কথা শুনে মুনকার-নকীর বলবে, তুমি সত্য বলেছ।

–(দুররে মনছুর)

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন : যখ আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর সামনে তাঁর সন্তানদের পেশ করলেন, আদম (আ.) তাদের দেখলেন কতিপয় কতিপয়ের উপর শ্রেষ্ঠ। অতঃপর সকলের নিচের দিকে একটি নূর দেখে জিজ্ঞেস করলেন : হে পরওয়ারদিগার, ইনি কে? এরশাদ হল, ইনি আপনার সন্তান আহমদ। তিনিই প্রথম নবী, তিনিই শেষনবী। তিনিই কেয়ামতের দিন প্রথম সুপারিশকারী। তাঁর সুপারিশ-ই প্রথম কবুল করা হবে।– (ইবনে আসাকের)

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আদম (আ.)-এর উভয় কাঁধের মাঝখানে লিখিত ছিল– মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী।'–(খাসায়েসুল কুবরা)

এ বিষয়ে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত অনেক হাদীস রয়েছে। গ্রন্থের কলেবর দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় হাদীসের উদ্ধৃতি সংক্ষিপ্ত করা হল।

হযূর (সা.)-এর ওফাতের অল্প কিছু দিন পূর্বে মুসায়লামা নামীয় দক্ষিণ আরবের ইয়ামামার অধিবাসী এক লোক নবী হওয়ার দাবী করে। হুযূর (সা.)-এর ওফাতের পর সকল সাহাবার সর্বসম্মতিক্রমে তাকে কাফের ঘোষণা দেওয়া হয়। মহানবীর ওফাতের পর এটাই সাহাবায়ে কেরামের প্রথম ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। এরপর হযরত সিদ্দীকে আকবর হযরত খালেদ বিন ওলীদের নেতৃত্বে বিশাল এক মুজাহিদ বাহিনী তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। খেলাফত লাভের পর এটাই হযরত সিদ্দীকে আকবরের প্রথম সৈন্য প্রেরণ। এখানে বোঝার বিষয় হল এই যে, মুসায়লামা নামক মিথ্যাবাদী লোকটি হুযূর (সা.)-এর নবুওয়ত এবং কুরআন অস্বীকার করেনি। তার দাবী ছিল মুহাম্মদও নবী; আমিও নবী। দেখা যাচ্ছে, একজন মানুষ মুসলমান হওয়ার জন্য হুযূর (সা.)-কে আখেরী নবী মানা ফরয; এটা ঈমানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ ব্যাপারে সকল সাহাবা ঐকমত্যে পৌছেছিলেন। আর যেমনিভাবে কুরআনের আয়াত ও হাদীসে রসূল (সা.) দীনী বিষয়ের শক্তিশালী প্রমাণ, তেমনি সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যও সমপর্যায়ের শক্তিশালী একটি দলিল। এ কারণেই চৌদ্দশ' বছর ধরে সারা পৃথিবীর সকল মুসলমান নিঃসংকোচে একথা মেনে আসছে।

সারকথা, যদি কেউ আল্লাহ তায়ালাকে ইলাহ বা প্রভু হিসেবে মানে, কিন্তু অদ্বিতীয় প্রভু বা একক প্রভু হিসেবে না মানে, তা হলে যেমন সে মুসলমান হতে পারবে না, তেমনি যদি কেউ হুযূর (সা.)-কে রসূল হিসেবে মানে; এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হিসাবেও মানে, কিন্তু আখেরী নবী হিসেবে না মানে তবে সেও মুসলমান হতে পারবে না, সেও ইসলামের আওতা হতে বাইরে ছিটকে পড়বে।[১]

খতমে নবুওয়ত সম্পর্কে এখানে সামান্য কয়েকটি কথা বললাম। এবার অনুবাদিত গ্রন্থ ও অনুবাদ সম্পর্কে দুটি কথা বলি।

---

১. মুফতী মুহাম্মদ শফী কৃত 'খতম নবুওয়ত' ও আল্লামা বদরে আলম মিরাঠী কৃত 'তরজমানুস সুন্নাহ' ১ম খণ্ড।

আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী লিখিত 'কাদিয়ানিয়্যাত' গ্রন্থখানি মূলতঃ কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে নিয়ে লেখা। গ্রন্থখানিতে এ সম্প্রদায়ের গোড়া পত্তন, উত্থান ও ক্রমবিকাশ নিয়ে প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 'খতমে নবুওয়ত' প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা হয়নি।

অনুবাদ যথাসত্বর শেষ করার ব্যাপারে উৎসাহ ও সর্ববিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতীব আলহাজ্ব মাওঃ উবায়দুল হক।

উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর যোগ্য উত্তরসুরী ড. কাজী দীন মুহম্মদ মূল পাণ্ডুলিপিখানি আগাগোড়া পড়ে স্থানে স্থানে সংশোধন করে দিয়েছেন। ভাষার পরিমার্জনের কৃতিত্ব তাঁরই। গ্রন্থখানি মুদ্রণের ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে নবুওয়ত বাংলাদেশ। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

জুবাইর আহমদ আশরাফ

কিছু কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهٗ۔

ঈসায়ী উনিশশ' সাতান্ন'র ডিসেম্বরের শেষ এবং উনিশশ' আটান্ন'র জানুয়ারীর শুরুর দিককার কথা। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় এক মজলিসে মুযাকারাতে ইসলামী (ইসলামিক কেলোকিয়াম)। যাতে ইসলামী দুনিয়া ও পশ্চিমা দেশগুলোর অনেক খ্যাতিমান জ্ঞানী গুণী এবং পণ্ডিতবর্গ অংশ গ্রহণ করেন। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম নিজেদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। মজলিসে মুযাকারাত-এর নাজেম ও আহবায়কের কাছ থেকে দাওয়াত পৌছার পরেও নির্দিষ্ট তারিখে আমি সেখানে উপস্থিত হতে পারিনি। মজলিস শেষ হওয়ার পর যখন লাহোর পৌছলাম, দেখতে পেলাম, বিশেষ করে মিসর ও সিরিয়ার প্রতিনিধিরা যেরকম বলিষ্ঠভাবে শরীয়তে ইসলামীর ওকালতি ও নিজেদের দীনী জযবার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তার চর্চা হচ্ছিল।

এ মহতী জলসায় শরীক হওয়ার জন্য, মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের যে সব ওলামা ও উসতাজগণ এসেছিলেন, তাঁরা উপমহাদেশের বিখ্যাত ধর্মীয় আন্দোলন 'কাদিয়ানী মতবাদ', এর মৌলিক বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এ অনুসন্ধিৎসা যথার্থই ছিল। অত্র এলাকায় যেহেতু এ আন্দোলনের প্রকাশ ও লালন হয়েছে, তাই এখান থেকেই এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যেতে পারে। ঠিক তখনই তাঁদের ভারত ও পাকিস্তানের বন্ধুদের এ অসম্পূর্ণতার কথা খেয়াল হলো যে, তাঁদের সামনে পেশ করার মত আধুনিক উপস্থাপনার মাধ্যমে আরবী ভাষায় এ বিষয়ে কোন পুস্তক নেই। এ অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার কারণে আমার লাহোর পৌছার পর, আমার শায়খ ও মুরুব্বী মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী সাহেব আমাকে এ বিষয়ে,আরবী ভাষায় একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করতে নির্দেশ দেন।

মধ্যপ্রাচ্যেরে সফরে মিসর এবং সিরিয়ায় অবস্থানকালে আমি নিজেও বহুবার এ বিষয়ের প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম। তবে এ দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ হয়ে উঠেনি। বিষয়টি তখনো আমার কাছে ছিল নতুন ও অজানা। কাদিয়ানী লিটারেচার এবং মির্যা সাহেবের রচনাবলীর স্বল্পতম অংশ অধ্যয়নেরও আমার সুযোগ হয়নি। উল্লিখিত নির্দেশ (যা মান্য করা আমার প্রভূত কল্যাণের বিষয় বলে বিবেচিত হয়েছে) বিষয়টির দিকে পুরোপুরি দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। অল্প কয়দিনের ভেতরই আমার হুজরাখানার একটি কুঠরী কাদিয়ানী লিটারেচরের লাইব্রেরীতে পরিণত হয়ে সম্পূর্ণ একাগ্রতার সাথে কাজ শুরু হয়ে গেল। দীর্ঘ একমাস যাবত এই ইলমী এতেকাফ এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, দুনিয়ার কোন বিষয়ের বিন্দুমাত্র খবরও ছিল না। এ বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের চিন্তাও মনে আসেনি।

লেখকের মনমানস যেহেতু সৃষ্টিগতভাবে ইতিহাস আশ্রিত, আর এ বিষয়ের উপর পদচারণাও নতুনভাবে হচ্ছে, তাই লেখার বেলায় সফরের যাত্রা শুরু হয়েছে কাদিয়ানী আন্দোলনের সূচনা থেকে। এরপর এ আন্দোলনের উত্থান ও ক্রমঅগ্রগতির এক এক মনযিলের বিবেচনা ও পুনর্বিবেচনার পর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে লেখকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আন্দোলনের ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে অগ্রসর হয়েছে। গবেষণার এ ধারা আন্দোলনটির চরিত্র, স্বভাব এবং এর ক্রম বিকাশ ও আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো বুঝতে সাহায্য করেছে। ফলে রহস্যের এমন দরজা উদঘাটিত হয়েছে, আন্দোলনটির বাইরের রূপ দেখে তা স্পষ্ট হতো না। মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের রচনাবলী লেখক সরাসরি অধ্যয়ন করেছে। এ অধ্যয়ন দ্বারা তার দাওয়াত ও আন্দোলনকে বুঝতে এবং একজন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ও সত্যসন্ধানীর ন্যায় পক্ষপাতহীন মত গ্রহণ করতে সার্বিক চেষ্টা করেছে। এ গবেষণা ও অনুসন্ধানের সারাৎসার হলো সেই আরবী পুস্তকটি, যা 'اَلْقَادِيَانِىْ وَالْقَادِيَانِيَّتْ' (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার কাদিয়ানী আন্দোলন) নামে মুদ্রিত হয়েছে।

উল্লিখিত কিতাবটি তৈরি হওয়ার পর, হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী সাহেবের নির্দেশ হলো, কিতাবটি উর্দুতে তর্জমা করে দেওয়ার। যেহেতু তর্জমা করতে গেলে মূল এবারত নকল করতে হয়, তাই পুনরায় আবার সেই বিশাল লাইব্রেরীর প্রয়োজন হয়ে পড়ল, যা লাহোরে একত্রিত করা

হয়েছিল। তাই সংগত কারণেই এ কাজটি লাহোরে বসে করাই ভাল মনে করা হলো। সুতরাং দ্বিতীয় বার লাহোরের উদ্দেশে সফর করা হলো। আলহামদু লিল্লাহ, মূল আরবী কিতাবটি উর্দুতে রূপান্তরিত করা হলো। বর্তমান পুস্তকটিকে আরবী কিতাবখানির তর্জমা না বলে এ বিষয়ে একটি মৌলিক রচনা বলা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। মূল এবারতগুলো (গ্রন্থে যেগুলোর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে) পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে মূল উৎস থেকে হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে। আরবী কিতাবটির মুকাবিলায় কিছু মূল্যবান সংযোজন এবং কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও করা হয়েছে।

হিন্দুস্তানের শেষ যুগে এসে দর্শনমূলক ও বিতর্কমূলক আলোচনাগুলোর উপস্থাপন রচনার বেলায় একটা নির্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয়। লেখক গতানুগতিক এ নিয়মের অনুসরণ করার প্রয়োজন মনে করেনি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে বিতর্কমূলক আবেগের পরিবর্তে ইতিহাস আশ্রিত গাম্ভীর্য বেশি পাওয়া যাবে। যাঁরা (প্রতিপক্ষের সাথে) বিতর্কমূলক আলোচনা পড়ায় অভ্যস্ত, তাঁরা এ গ্রন্থ পাঠ করে নিরাশ হবেন, এমনকি অভিযোগও তুলতে পারেন। তবে লেখক এর জন্য তাঁদের কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। লেখক গ্রন্থখানি যাদের জন্য ও যে উদ্দেশে লিখেছেন এবং এর জন্য যে মান নির্ধারণ করেছেন, সে দিক থেকে এ রচনারীতিই অধিক যুক্তিপূর্ণ।

আমি আমার ঐসব বন্ধু বান্ধবদের শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁরা আমাকে ইলমীভাবে পথ প্রদর্শন করেছেন, প্রয়োজনীয় কিতাবাদি সংগ্রহ করে দিয়েছেন এবং এ কাজটি পরিপূর্ণ করার ব্যাপারে আমার জন্য সব ধরনের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ অক্ষম লেখক যদি গ্রন্থখানি রচনা করে দীনের কোন খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন, তবে এঁরাও নিঃসন্দেহে ছওয়াবে শরীক থাকবেন।

পরিশেষে পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ : জীবন অনেক মূল্যবান। মানুষ নিজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং সম্পদ অহেতুক ব্যয় করা থেকে বেঁচে থাকে, আর এর সংরক্ষণ করার জন্য যোগ্য আমানতদারের সন্ধান করে। ঈমান (যার উপরে পরকালের চিরস্থায়ী শান্তি সীমাবদ্ধ,) নিঃসন্দেহে এর থেকে অনেক বেশি উপযুক্ত যে, মানুষ তার ব্যাপারে পূর্ণ সজাগ সতর্ক থাকবে এবং জাগতিক

লোভ লালসা থেকে পুরোপুরি দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবে। এ কিতাবে নির্ভরযোগ্য ও সুবিন্যস্ত আলোচনা এবং আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনকারীর বক্তব্য ও রচনাবলীর মাধ্যমে এমন সব তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়েছে, যা একজন অসাম্প্রদায়িক ও নিরপেক্ষ লোককে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ

মরহুম প্রফেসর মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবের 'কাদিয়ানী মাযহাব' নামক গ্রন্থখানি লেখককে প্রাথমিকভাবে পথ প্রদর্শন করেছে এবং এর থেকে গ্রন্থটি সুন্দরভাবে সাজানোর ধারণা নেওয়া হয়েছে। যদিও লেখক নকল বা উদ্ধৃতিকে যথেষ্ট মনে করেনি এবং মির্যা সাহেব ও কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের রচনাবলী সরাসরি অধ্যয়ন করেছে, তবুও প্রফেসর সাহেবের উল্লিখিত কিতাবটি থেকে অনেক কিছু সংগ্রহ করেছে। আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁর দীনী জযবা ও ইলমী খেদমত কবুল করেন এবং তাঁকে স্বীয় রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করেন।

আবুল হাসান আলী

লাহোর জুমাবার, ১১ই রবিউল আউয়াল

১৩৭৮ হিজরী

প্রথম অধ্যায়

কাদিয়ানী আন্দোলন : সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত

ও

কেন্দ্রীয় চরিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈসায়ী উনিশ শতকের ভারতবর্ষ

উনবিংশ শতাব্দী এ দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার যে, এ শতাব্দীতে ইসলামী দুনিয়ায় আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত পূর্ণ যৌবনে পৌছে গিয়েছিল। ভারতবর্ষ ছিল এ অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশিষ্ট ক্ষেত্র। এখানে একই সময়ে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতায়, নতুন ও পুরনো শিক্ষাব্যবস্থা ও চিন্তাধারায় এবং ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদের এক তুমুল সংঘর্ষ চরমে পৌছে গিয়েছিল; উভয় শক্তিই জীবন ব্যবস্থার জন্য একে অপরের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

আঠারশ' সাতান্ন সনের স্বাধীনতার সর্বশেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ভারতবর্ষের মুসলমানের অন্তঃকরণ ছিল পরাজয়ের গ্লানিতে আহত এবং তাদের মস্তিষ্ক ব্যর্থতার আক্রমণে ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় ক্ষেত্রে গোলামীর ভয়ে তারা ছিল জর্জরিত। একদিকে বিজয়ী ইংরেজ বাহিনী এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারের কাজ শুরু করে দিয়েছিল, অপর দিকে হিন্দুস্তানের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা খ্রিষ্টান পাদ্রীরা খ্রিষ্টবাদ প্রচারে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল। ওরা মুলমানের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোয় এবং শরীয়তে ইসলামীর উৎসগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করে দেওয়া নিজেদের সাফল্যের বিষয় মনে করতো। মুসলমানের নতুন প্রজন্ম, যাদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ পুরেপুরি স্থান করে নিতে পারেনি, খ্রিষ্টানরা তাদের বানালো নিজেদের লক্ষ্যস্থল। বিশেষ করে স্কুল কলেজকে মনে করা হলো উপযুক্ত ময়দান। তখন হিন্দুস্তানে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের ঘটনাও শুরু হল। তবে তখন ধর্মান্তরিত হওয়াই মুল সমস্যা বা ইসলামের জন্য ভয়ের কারণ ছিল না; ভয়ের কারণ ছিল, ধর্মদ্রোহিতা এবং ইসলামের মৌল বিষয়গুলোয় সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া। এ সময় খ্রিষ্টান ধর্মযাজক এবং মুসলমান আলেমদের মাঝে এখানে সেখানে বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হতো। যেগুলোতে সাধারণত ইসলামের আলেমদের বিজয় সূচিত হয়েছে এবং খ্রিষ্টবাদের মুকাবিলায়, জ্ঞান ও যুক্তির

নিরিখে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও মন মানসে একরকম দ্বিধা এবং ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাসে এক ধরনের সংশয় দানা বাঁধতে থাকে।

অপর দিকে মুসলমানদের ফেরকাগুলোর নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত দিনের পর দিন বিশ্রী রূপ ধারণ করছিল। প্রতিটি গ্রুপই কোমর বেঁধে অপর গ্রুপের বিরোধিতায় লেগে গিয়েছিল। ধর্মীয় বিতর্ক সভার বাজার ছিল তখন খুবই গরম। যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মারামারি ও হানাহানির পর্যায়ে চলে যেত।

এক কথায়, সারা ভারতে একটা ধর্মীয় আত্মকলহের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এরকম অবস্থা সকলের মনের মধ্যে একটা বিশৃংখলা, হতাশার ভাব ও ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের অবনতি সৃষ্টি করে দিয়েছিল। যার পরিণামে ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা এবং দীনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধও কমে গিয়েছিল।

অন্য দিকে মূর্খ সূফীদের বদৌলতে তরীকত ও আধ্যাত্মিকতা পরিণত হয়ে গিয়েছিল ছেলেখেলায়। তাঁরা নিজেদের অবচেতন অবস্থায় মুখ দিয়ে বের হয়ে যাওয়া কথাগুলো জোরে-শোরে প্রচার করতো। স্থানে স্থানে অনেকেই এলহাম বা স্বর্গীয় বাণীপ্রাপ্তির দাবীদার ছিল এবং আশ্চর্য আশ্চর্য অস্বাভাবিক কথা ও সুসংবাদ বর্ণনা করে ফিরতো। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সাধারণ মানুষের মাঝে সূক্ষ্ম রহস্য, অস্বাভাবিক কথা এবং গায়েবী সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী শোনার জন্য অতি মাত্রায় আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। যে ব্যক্তি এ ধরনের বস্তু যত বেশি পেশ করতে পারতো, সাধারণ্যে তার কদরও তত বেড়ে যেত। তিনি মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়ে যেতেন। ধূর্ত সূফীরা সাধারণ মানুষের এ মানসিকতার সুযোগে পুরোপুরি ফায়দা হাসিল করে নিয়েছিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত মানুষের মন মগজবাধের অগম্য বস্তু গ্রহণ করার, প্রত্যেক নতুন কিছু মেনে নেওয়ার এবং নতুন দাওয়াত ও আন্দোলনে শরীক হওয়া ও সকল আজগুবি কথা বিশ্বাস করার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানই প্রায় হতাশা, নৈরাশ্য ও পরাজিত মনোবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিল। ১৮৫৭ সনের বিপ্লবের পরিণাম এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামরিক আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণে, মানুষের মনে এ কথা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, ছোটখাট কোন চেষ্টা তদবীরে এ অবস্থার সংশোধন সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের সিংহভাগ এর অপেক্ষায় ছিল যে, অচিরেই গায়েবী সাহায্যপ্রাপ্ত

কোন সিদ্ধ পুরুষের আবির্ভব হবে। কোথাও কোথাও এ ধারণাও প্রকাশ করা হতো যে, হিজরী তেরতম শতাব্দী শেষ হওয়ার সাথে সাথেই 'মসীহ মওউদ'-এর আগমন ঘটবে। মজলিসে মজলিসে চর্চা হতো শেষ যমানার ফিৎনা ফাসাদ ও ভয়াবহ ঘটনাগুলোর। শাহ নেয়ামতুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর ভিত্তি করে মায়াকান্না করা হতো। স্বপ্ন, ভবিষ্যদ্বাণী ও গায়েবী ইশারার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ছিল চুম্বকের ন্যায় এবং এগুলোকে ওরা অষুধ মনে করতো নিজেদের ভগ্ন আত্মার জন্য।

ভারতের পাঞ্জাব ছিল এ ধরনের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও বিশ্বাসহীনতার অন্যতম কেন্দ্র। হিন্দুস্তানের এ অঞ্চল একাদিক্রমে আশি বছর শিখদের অত্যাচার সহ্য করে আসছিল; যা ছিল একটা স্বেচ্ছাচারী সামরিক শাসন। এ এক'শ বছরের কম সময়ের মধ্যে পাঞ্জাবের মুসলমানের ধর্মীয় বিশ্বাসে দুর্বলতা এসে গিয়েছিল। ইসলামের নির্ভেজাল শিক্ষা থেকে যুগ যুগ ধরে তারা ছিল অনেক দূরে। ধর্মীয় ব্যাপারে প্রায় সকলেই ছিল হতাশা ও সংশয়ের শিকার। আল্লামা ইকবালের ভাষায় :

'স্বাধীন ভূমি তলোয়ার ও কুরআন নিয়ে গেছে। দেশের মাঝে মুসলমানীও মৃত্যুবরণ করেছে।'

সমসাময়িক এ পরিপ্রেক্ষিত পাঞ্জাবকে আধুনিক আন্দোলনের উপযোগী এমন এক ময়দানে পরিণত করে দিল, স্বপ্ন, অলীক কল্পনা ও দুর্বোধ্য ব্যাখ্যার উপর যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। জাতির মানসিকতা এমন হয়ে গিয়েছিল, ইকবাল যাকে এভাবে বর্ণনা করে গেছেন :

'তার স্বভাব, ধর্মের ব্যাপারে নিত্য নতুনকে পছন্দ করা। পথ অতিক্রম করার সময় যেখানে ইচ্ছা সেখানেই সে থেমে যায়।'

'রহস্য অনুসন্ধানের প্রতিযোগিতা হলে সে সেখানে অংশ গ্রহণ করে না। মুরীদ হওয়ার খেলা চললে অতি দ্রুত সে সেখানে হেরে যায়।'

'যদি কোন শিকারী অদ্ভুত কথার জাল বিছিয়ে দেয়, তবে সে পাখীর ন্যায় গাছের ডাল থেকে দ্রুত সেখানে অবতরণ করে।'

এ উনিশ শতকের শেষের দিকে মির্যা গোলাম আহমদ স্বীয় অদ্ভুত আন্দোলনের দাওয়াত নিয়ে সকলের সামনে হাজির হয়। তার দাওয়াত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার উপযুক্ত স্থান ও সময় মিলে যায়। মানুষের মনের হতাশা,

সাধারণ মানুষের আশ্চর্য কিছুকে দ্রুত গ্রহণ, ইসলাহ ও সংশোধনের স্বাভাবিক পদ্ধতি থেকে নৈরাশ্য, ওলামায়ে কেরামের প্রতি নির্ভরতা ও শ্রদ্ধাবোধ ক্ষীণ হয়ে যাওয়া, ধর্মীয় বিষয়গুলোর অধিক পরিমাণে চর্চা, এর ফলে জনগণের মাঝে ধর্মীয় বিষয়ে স্বেচ্ছাচারের সৃষ্টি, এ সব কিছুই তার জন্য অনুকূল পরিবেশ বলে প্রমাণিত হয়। অপর দিকে তদানীন্তন শাসকবর্গ (যারা মুজাহিদদের আন্দোলনে অপমানিত হয়েছে এবং মুসলমানের জিহাদ স্পৃহার ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল) এ আন্দোলনকে সাদরে অভিনন্দন জানায়। ইংরেজ শাসকদের সাথে ছিল এ আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনকারীর সুনিবিড় সম্পর্ক, আর সে ইংরেজদের আনুগত্যকে স্বীয় মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্গত করে নিয়েছিল।

এ সকল কারণ একত্রে মিলে একটি উপযুক্ত আবহের সৃষ্টি করে, যার মাঝে এ নতুন আন্দোলন অস্তিত্বে আসে। অবশেষে এটি একটি স্বতন্ত্র সক্রিয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

এ আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ, উত্থান ও চরিত্র, এর পরিণতি এবং এর ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক অবস্থান নিয়ে পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী[১]

বংশ পরিচয়

মির্যা সাহেবের গোত্রীয় সম্পর্ক মোগল বংশের বরলাছ শাখার সাথে। 'কিতাবুল বারিয়্যাহ'র টীকায় তিনি লিখেছেন : 'মোগল বরলাছ আমার গোত্র।'[২] তবে কিছুকাল পর এলহামের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, তিনি ইরানী বংশোদ্ভূত। ঐ গ্রন্থেরই অপর টীকায় তিনি লিখেছেন, আমার ব্যাপারে স্বর্গীয় এলহাম এই যে, 'লাও কানাল ঈমানু মুয়াল্লাকান বিছু ছুরাইয়্যা লানালা রাজুলুম মিন ফারিছিন;[৩] অর্থাৎ, ঈমান যদি ছুরাইয়্যা তারকায়ও ঝুলন্ত থাকে, তবে পারস্যর বংশোদ্ভূত এ ব্যক্তি তা গিয়ে নিয়ে আসবে। আর তৃতীয় একটি এলহাম আমার ব্যাপারে এই–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَدَّ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسٍ، شَكَرَ اللّٰهُ سَعْيَهٗ

অর্থাৎ, যারা কাফের হয়ে গেল, এ ইরানী বংশোদ্ভূত ব্যক্তি তাদের ধর্ম প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন।' আল্লাহ তায়ালা এ ব্যক্তির চেষ্টার শুকরিয়া আদায়কারী। এ সব স্বর্গীয় ইংগিত এ কথা প্রকাশ করে যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা পারস্যের ছিলেন। আর সত্য তা-ই যা আল্লাহ প্রকাশ করেন।[৪]

---

১. মির্যা সাহেবের জীবনীর ব্যাপারে স্বয়ং মির্যা সাহেবের বর্ণনা ও রচনাবলীর উপর ভিত্তি করেছি। এ ছাড়া তাঁর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত অপরাপর ঘটনার ব্যাপারে, তাঁর পুত্র মির্যা বশীর উদ্দীন সাহেবের লেখা 'সীরাতুল মাহদী' এবং কাদিয়ানী জামাতের লেখা অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

২. কিতাবুল বারিয়্যাহ– টীকা অংশ, পৃ-১৩৪

৩. এ হাদীসটি শব্দের সামান্য তারতম্যের সাথে সিহাহ সিত্তায় এসেছে। কোন বর্ণনায় 'রিজালুম মিন ফারিসিন'ও এসেছে। মোহাদ্দেসীনে কেরাম এর থেকে হযরত সালমান ফারেসী (রা.) এবং ইরানী বংশোদ্ভূত অন্যান্য বিখ্যাত আলেম ওলামাকে বুঝিয়েছেন, যাদের ঈমানী শক্তি এবং দীনী খেদমতের ব্যাপারে বিশেষ স্থান রয়েছে। এদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফাও রয়েছেন।

৪. কিতাবুল বারিয়্যাহ (টীকা), পৃষ্ঠা-১৩৫

আরবাঈন[৫] নামক গ্রন্থেও তিনি লিখেছেন : এ কথা স্মর্তব্য যে, এই খাকছার মোগল বংশোদ্ভূত। আমাদের গোত্রের ইতিহাসে এ আলোচনা পাওয়া যায় না যে, এটা ইরানী বংশের। তবে কোন পুরনো কাগজপত্রে দেখা গেছে, আমাদের জনৈক দাদী সম্ভ্রান্ত সাইয়েদ বংশের ছিলেন। এখন আল্লাহর বাণী দ্বারা জানা যায়, মূলতঃ আমাদের বংশ ইরানী বংশ, সুতরাং এর উপর আমরা পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি। কেননা, বংশের যথার্থ পরিচয় যেমনভাবে আল্লাহর জানা আছে, অপর কারুর নেই। আল্লাহর জ্ঞানই সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য, আর অপর সকলের জ্ঞান সন্দেহযুক্ত ও অনুমানভিত্তিক।[৬]

মির্যা সাহেবের পরদাদা মির্যা গুল মুহম্মদ অনেক জমিজমার মালিক ছিলেন। পাঞ্জাবে তার ভাল জামিদারী ছিল। মির্যা সাহেব স্বীয় পরদাদার সর্দারসুলভ শান শওকত, জাঁকজমকপূর্ণ মর্তবা, মেহমানদারী এবং দীনী চাল চলন সবিস্তার লিপিবদ্ধ করেছেন।[৭]

তাঁর ইন্তেকালের পর এ জমিদারীর পতন শুরু হয়। শিখেরা গ্রামের জমিগুলো হস্তগত করে ফেলে। এমনিভাবে মির্যা সাহেবের দাদা মির্যা আতা মুহম্মদের কাছে শুধু কাদিয়ান রয়ে যায়। শেষতক শিখেরা এর উপরও আধিপত্য বিস্তার করে এবং মির্যা সাহেবের গোত্রের লোকদের কাদিয়ান থেকে বের করে দেয়। মহারাজ রণজিৎ সিংহ-এর রাজত্বের শেষ সময় মির্যা সাহেবের পিতা মির্যা গোলাম মুর্তাজা কাদিয়ানে ফিরে আসেন। পরিশেষে মির্যা সাহেব স্বীয় পিতার অঞ্চলে পাঁচটি গ্রাম ফিরে পান।[৮]

মির্যা সাহেবের গোত্র ইংরেজ রাজত্বের– যা পাঞ্জাবে তখন নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল– বড়ই অনুগত ছিল। গোত্রের অনেক সদস্য এ নতুন রাজত্বের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছে। আর অনেক জটিল মুহূর্তে ইংরেজ শাসনের সাহায্য করেছে। মির্যা সাহেব কিতাবুল বারিয়্যাহ'র শুরুতে ইশতেহার ওয়াজিবুল এজহার' অংশে লিখেছেন :

'আমি এমন এক বংশের অন্তর্ভুক্ত, যারা এ সরকারের পাকা খায়ের খা। আমার পিতা মির্যা গোলাম মুর্তাজা, সরকারের দৃষ্টিতে পুরোপুরি অনুগত ও

৫. প্রাগুক্ত।
৬. আরবাঈন– টীকা অংশ, পৃ-১৭
৭. দ্রষ্টব্য : কিতাবুল বারিয়্যাহ'র টীকা, পৃ-১৩৬-১৪২
৮. দ্রষ্টব্য : কিতাবুল বারিয়্যাহ'র টীকা, পৃ-১৪২-১৪৪

খায়ের খা ব্যক্তি। সরকারের দরবার থেকে যার কুরসী মিলেছিল। মিষ্টার গ্রীফন যার কথা পাঞ্জাবের জমিদারদের ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন। ১৮৫৭ সনে তিনি পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে ইংরেজ সরকারের সহযোগিতা করেছেন। অর্থাৎ, ঠিক বিদ্রোহের সময় ঘোড়াসহ পঞ্চাশজন সওয়ার পৌছিয়ে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করেছেন। এ খেদমতের কারণে আমলারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাকে অনেক চিঠি দিয়েছিলেন। তবে পরিতাপের বিষয়, এর মধ্যে থেকে অনেকগুলো চিঠি হারিয়ে গেছে। তিনটি চিঠি যা অনেক দিন পূর্বে মুদ্রিত হয়েছে, এগুলোর অনুলিপি টীকায় দেওয়া হল। অতঃপর আমার দাদার মৃত্যুর পর আমার বড় ভাই মির্যা গোলাম কাদের সরকারী খেদমতে লিপ্ত ছিলেন। যখন ইংরেজ সেনাবাহিনীর সাথে সন্ত্রীদের মুকাবিলা হয়েছিল, তখন তিনি ইংরেজ সরকারের পক্ষ হয়ে লড়াইয়ে শরীক হয়েছিলেন।[৯]

জন্ম ও শিক্ষা দীক্ষা

মির্যা সাহেব শিখ হুকুমতের শেষ দিকে, ১৮৩৯ অথবা ১৮৪০ সনে গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১০] তার লেখা থেকে জানা যায় : ১৮৫৭ সনের হাংগামার সময় তার বয়স ছিল ষোল/সতের বছর।[১১]

মির্যা সাহেব মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নিজের বাড়িতেই শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি মওলবী ফযলে এলাহী, মওলবী ফযলে আহমদ, মওলবী গুল আলী শাহ্ সাহেবের কাছে নাহু, মানতেক ও দর্শনের কিতাবগুলো পড়েছেন। চিকিৎসা

---

৯. ইশতেহার ওয়াজিবুল এজহার, তারিখ : সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ ঈসায়ী; কিতাবুল বারিয়্যাহ'য় সংযুক্ত।

১০.১১ কিতাবুল বারিয়্যাহ'র টীকা। পৃ-১৪৬; ১৯২২ সনে বৃটেনের যুবরাজের উদ্দেশে মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ যে শ্রদ্ধাঞ্জলি পেশ করেছিলেন, তাতে মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের জন্মসন লেখা আছে ১৮৩৬ (পৃ-৩৫)। এ হিসেবে ঈসায়ী ১৮৫৭ সনে তার বয়স হয় একুশ বছর। সম্ভবত মির্যা সাহেবের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার জন্য এই পরিবর্তন করা হয়েছে, যা ঐশীবাণী হিসেবে আরবাঈন গ্রন্থে তিনি লিখেছেন–

لا حيينک حيوة طيبة ثمانين حولا او قريبا من ذالک۔

আমি তোমাকে পবিত্র এক শান্তির জীবন দান করবো, যা হবে আশি বা তার নিকটতম বছর। –(আরবাঈন (৩), পৃ-৩৯)

বিজ্ঞানের কিতাব স্বীয় পিতার কাছে পড়েছেন, যিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক। মির্যা সাহেবের ছাত্র বয়সে কিতাব অধ্যয়নে যথেষ্ট একাগ্রতা ছিল। তিনি লিখেছেন, ঐ সময় আমার কিতাব অধ্যয়নে এতখানি আগ্রহ ছিল, যেন আমি দুনিয়াতেই ছিলাম না। আমার পিতা আমাকে বাবংবার এই হেদায়েত করতেন, অধ্যয়ন কম করা উচিত। কেননা তিনি মমতাবশত স্বাস্থ্যের অবনতির ভয় করতেন।[১২] এই সিলসিলা বেশি দিন পর্যন্ত জারি ছিল না। পিতার কড়া নির্দেশে মির্যা সাহেব পৈতৃক জমিদারী অর্জন করার জন্য চেষ্টা তদবীর ও আদালতী মামলা মোকদ্দমায় যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি লিখেছেন : আমার দুঃখ হয়, বহু সময় আমার এ গোলমালে নষ্ট হয়েছে। এর সাথে পিতা মহোদয় আমাকে জমিদারী তদারক করার কাজেও লাগিয়ে দেন; অথচ আমি এ মানসিকতার ব্যক্তি ছিলাম না।[১৩]

কর্মজীবন

মির্যা সাহেব শিয়ালকোট শহরে কমিশনারের কাচারীতে অল্প বেতনে চাকরি করেছিলেন। ১৮৬৪ সন থেকে ১৮৬৮ সন পর্যন্ত চার বছর তিনি এ চাকরিতে বহাল থাকেন।[১৪] চাকরিরত অবস্থায় ইংরেজি সাহিত্যেরও দু'একটি গ্রন্থ তিনি পড়েছেন।[১৫] এ সময় তিনি মোক্তারীর পরীক্ষাও দিয়েছিলেন; তবে এতে উত্তীর্ণ হতে পারেননি।[১৬] ১৮৬৮ সনে তিনি এ চাকরি ইস্তেফা দিয়ে কাদিয়ানে চলে আসেন এবং যথারীতি জমিদারীর কাজে মশগুল হয়ে যান। তবে অধিকাংশ সময় কুরআনের তাফসীর ও হাদীস অধ্যয়নে সময় কাটাতেন।[১৭]

চরিত্র ও গুণাবলী

মির্যা সাহেব শৈশবকাল থেকেই সহজ সরল ছিলেন, দুনিয়াবী বিষয়ের ব্যাপারে উদাসীনতা শুরু থেকেই তার মধ্যে পরিলক্ষিত হতো।

১২. কিতাবুল বারিয়্যাহ, পৃ-১৪৯, ১৫০
১৩. কিতাবুল বারিয়্যাহ পৃ-১৫১
১৪. সীরাতুল মাহদী, প্রথম খণ্ড পৃ-৪৪
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৫।
১৬. প্রাগুক্ত. পৃ-১৫৬
১৭. কিতাবুল বারিয়্যাহর টীকা, পৃ-১৫৫

ঘড়িতে তিনি চাবি দিতে পারতেন না।[১৮] সময় দেখার প্রয়োজন হলে ঘড়ি বের করে সংখ্যা গণনা করে সময় বের করতেন। আঙ্গুল রেখে রেখে সংখ্যা গুনতেন এবং মুখেও গণনা করে যেতেন। ঘড়ি দেখেই সময় বুঝতেন না।[১৯] প্রবল ঔদাসীন্যের কারণে কখনো কখনো ডান জুতো বাম জুতোর পার্থক্য করতে পারতেন না। মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাতুল মাহদী গ্রন্থে লিখেছেন: একবার কোন ব্যক্তি তাঁর জন্য গুরগাবী নামের এক প্রকার জুতা নিয়ে এলেন। তিনি অনায়াসে পরিধান করে ফেললেন, উল্টো সিধা তিনি বুঝতেন না। কখনো কখনো উল্টো করে পায়ে দিয়ে ফেলতেন: যার দরুন পরিধান করতে কষ্ট হতো। কখনো উল্টো পায়ে দিয়ে ফেললে বিরক্ত হয়ে বলতেন, তাঁর কোন বস্তুই ভাল লাগে না। আমার মাতা বলেছেন: আমি তাঁর সুবিধার জন্য উল্টো সিধার চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলাম; এতদসত্ত্বেও তিনি উল্টো পরে ফেলতেন। এ জন্য আম্মাজান এগুলো ফেলে দিয়েছিলেন।[২০] বার বার পেশাব করার প্রয়োজন হতো বলে তিনি পকেটে ঢিলা রাখতেন। মিঠাই'র প্রতি অত্যধিক আগ্রহ থাকার কারণে পকেটে কখনো কখনো গুড়ের টুকরোও রেখে দিতেন।[২১]

মির্যা সাহেবের স্বাস্থ্য ও রোগ

যৌবনকালে মির্যা সাহেবের হিষ্ট্রিয়া ছিল। কখনো এর ব্যাথা এত বেড়ে যেত যে, বেহুশ হয়ে পড়ে যেতেন।[২২] মির্যা সাহেব এ ব্যাধিটাকে কখনো হিষ্ট্রিয়া, কখনো মস্তিষ্ক বিকৃতি বলে বক্ত করেছেন। তার ডায়াবেটিস এবং বহুমূত্রের রোগ ছিল। এক স্থানে 'আমি এক চিররোগী মানুষ' শিরোনাম দিয়ে

---

১৮. ইয়াদে আইয়্যাম : কাজী মুহাম্মদ জহুরুদ্দীন কাদিয়ানী; দ্রষ্টব্য : আখবারুল হেকাম, কাদিয়ান, বিশেষ সংখ্যা, ২১ মে ১৯৩৪ ঈসায়ী। কাদিয়ানী মাযহাব থেকে সংগৃহীত।

১৯. সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড পৃ-১৮০

২০. প্রাগুক্ত, পৃ-৬৭

২১. মে'রাজুদ্দীন ওমর কাদিয়ানী রচিত মির্যা সাহেবের জীবনী, যা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বারাহীনে আহমদিয়া'য়। দেখুন বারাহীনে আহমদিয়া ১ম খণ্ড, পৃ-৬৭।

২২. সীরাতুল মাহদী, খণ্ড-১, পৃ-১৭

লিখেছেন : সব সময় মাথাব্যথা থাকে। মাথা ঘোরা, অনিদ্রা এবং খিচুনির রোগ ঘুরে ঘুরে আসে। আর অপর যে অসুখ আমার শরীরের নিম্নদেশে রয়েছে তা হলো, অনেক দিন ধরে ডায়াবেটিস ছিল। সময়ে সময়ে রাতে বা দিনে শত শত বার পেশাব করতে হয়। এত অধিক হারে পেশাব হওয়ার কারণে শরীরের যে পরিমাণ দুর্বলতা এসে যায়, তার সবই আমার থাকে।[২৩]

মির্যা সাহেব যৌবনকালে মোজাহাদা এবং চিল্লাকাশীও করেছিলেন। লাগাতার রোযাও রাখতেন। তিনি একটি বড় ধরনের চিল্লা করেছিলেন, যাতে বরাবর ছ'মাস পর্যন্ত রোযা রেখেছিলেন।[২৪] তিনি ১৮৮৬ সনে হোসিয়ারপুরে একটি চিল্লা দিয়েছিলেন।[২৫] শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যের দুর্বলতার কারণে মোজাহাদার এই সিলসিলা খতম করে দেন। ১৮৯১ সনের ৩১ মার্চ তারিখে এক চিঠিতে হাকীম নুরুদ্দীন সাহেবকে লিখেছেন : তবিয়ত এখন মোজাহাদার দুঃখ কষ্ট বরদাশত করতে পারছে না। সামান্য মেহনত করলেই স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়।[২৬]

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য

মির্যা সাহেব স্বীয় জীবন শুরু করে ছিলেন দারিদ্র, অনটন ও অত্যন্ত কষ্টের সাথে। তবে দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজ চালু করার পর যখন তিনি অনেক মানুষের আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক হয়ে গেলেন, তখন তাঁর অভাব দূর হয়ে স্বচ্ছলতা চলে আসে। এর পর তিনি প্রাচুর্যের জীবন যাপন শুরু করেন। তাঁর নিজেরও এ পরিবর্তন এবং প্রথম ও শেষ জীবনের এ তারতম্যের কথা খেয়াল ছিল। ১৯০৭ সনে নিজের প্রথম অবস্থার সাথে বর্তমান অবস্থার পার্থক্য দেখিয়ে এক স্থানে লেখেছেন: আমাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা শুধু পিতা মহোদয়ের ছোট একটি আমদানী ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতো। বাইরের কেউ এ কথা জানতো না। আমি ছিলাম একজন অপরিচিত লোক, কাদিয়ানের ন্যায় একটি জনমানবহীন বিরান গ্রামের এক কোণে পড়ে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা

---

২৩. আরবাঈন-এর পরিশিষ্ট, পৃ-৩, ৪ (পৃষ্ঠা নং-৪ সংক্ষেপিত)

২৪. সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ-৭৬

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ-৭১

২৬. মকতুবাতে আহমদিয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃ-১০৩

স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এক দুনিয়া আমার দিকে রুজু করে দিয়েছেন। আর একটার পর একটা এমন সাফল্য আমাকে দিয়েছেন, যার শুকরিয়া আদায় করার ভাষা আমার জানা নেই। আমার নিজের অবস্থার কথা খেয়াল করে এতটুকু আশাও আমার ছিল না যে, মাসিক দশ টাকা পরিমাণ আয় আসবে। তবে আল্লাহ তায়ালা– যিনি দরিদ্রদের মাটি থেকে উঠিয়ে নেন এবং অহংকারীদের মাটির সাথে মিশিয়ে দেন– আমার এতটুকু সাহায্য করেছেন যে, আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আজ পর্যন্ত তিন লাখ টাকার কাছাকাছি এসে গেছে, সম্ভবত তার চেয়েও বেশি।[২৭]

এর নীচে টীকায় লেখেছেন : যদিও মনি অর্ডারের মাধ্যমে হাজারো টাকা এসেছে, নিষ্ঠাবান মানুষেরা এসে যা দিয়ে গেছেন তা এর চেয়ে বেশী, আর সে পরিমাণ নোট চিঠিপত্রের ভেতর এসেছে। কোন কোন ভক্ত তো নোট অথবা সোনা এমনভাবে পাঠিয়েছে, যারা নিজেদের নামও প্রকাশ করেনি। আজো আমার জানা নেই তাদের পরিচয় কী।[২৮]

বিবাহ ও সন্তান

মির্যা সাহেব প্রথম বিবাহ ১৮৫২ বা ১৮৫৩ সনে নিজের গোত্রে করেছেন।[২৯] এ স্ত্রীর পক্ষ থেকে দুই ছেলে মির্যা সুলতান আহমদ, মির্যা ফযলে আহমদ জন্ম গ্রহণ করেন। এ স্ত্রীকে তিনি ১৮৯১ সনে তালাক দিয়ে দেন। দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে ১৮৮৪ সনে, দিল্লীর নওয়াব নাসির সাহেবের মেয়ের সাথে।[৩০]

মির্যা সাহেবের বাকি সন্তানগুলো শেষের স্ত্রীর গর্ভে জন্ম লাভ করেছে। এ দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্মলাভ করেছে তিন ছেলে : মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ, মির্যা বশীর আহমদ (সীরাতুল মাহদীর রচয়িতা) ও মির্যা শরীফ আহমদ।

---

২৭. হাকীকতুল অহী, পৃ-২১১

২৮. হাকীকতুল অহী, টীকা-২১১

২৯. সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, পৃ- ১৫০

৩০. সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৫১

ওফাত

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব যখন ১৮৯১ সনে মসীহ মওউদ হওয়ার দাবী করলেন,[৩১] অতঃপর ১৯০১ সনে নবুওয়তের দাবী করে বসলেন,[৩২] তখন ওলামায়ে ইসলাম তার বিরোধিতা শুরু করেন। বিরুদ্ধাচারণকারীদের মধ্যে আহলে হাদীস পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। মির্যা সাহেব ১৯০৭ সনের ৫ই এপ্রিল একটি ইশতেহার জারি করেন। যাতে মাওলানাকে উদ্দেশ করে লেখেছিলেন–

"যদি আমি এরূপ মিথ্যাবাদী ও প্রতারক হয়ে থাকি, যেরূপভাবে আপনি অধিকাংশ সময় নিজের প্রত্যেক কাগজে লেখে থাকেন, তবে আমি আপনার জীবৎকালেই ধ্বংস হয়ে যাব। কেননা আমি জানি, মিথ্যাবাদী, অনর্থ সৃষ্টিকারী বেশি দিন বাঁচে না। শেষ পর্যন্ত সে অপমান অপদস্থতার সাথে নিজের বড় দুশমনের যিন্দেগীতেই ধ্বংস হয়ে যায়। আর এর ধ্বংস হয়ে যাওয়াটাই উত্তম, যেন আল্লাহর বান্দাদের বরবাদ না করতে পারে।

আর যদি আমি মিথ্যাবাদী না হয়ে থাকি; বরং আল্লাহর নির্দেশপ্রাপ্তির সম্মানে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং মসীহ মওউদ হয়ে থাকি, তবে আমি আল্লাহর ফযলে দৃঢ় আশা রাখি, সুন্নাতুল্লাহ অনুসারে আপনি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবেন না। সুতরাং যদি সে শাস্তি– যা মানুষের হাত থেকে নয়; বরং আল্লাহর হাত থেকে হয়; অর্থাৎ প্লেগ, কলেরা ইত্যাদি মারাত্মক অসুখগুলো আপনার উপর আমার জীবদ্দশায় পতিত না হয়,[৩৩] তবে আমি আল্লাহর প্রেরিত নয়।[৩৪]

এ ইশতেহারের এক বছর পর ১৯০৮ সনের ২৫ শে মে বাদ' এশা লাহোরে অবস্থানকালে মির্যা সাহেবের পাতলা পায়খানা শুরু হয়। রাত্রেই

---

৩১. বিস্তারিত জানার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দেখা যেতে পারে।

৩২. বিস্তারিত জানতে হলে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ দেখা যেতে পারে।

৩৩. মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহ.) মির্যা সাহেবের ওফাতের পূর্ণ চল্লিশ বছর পর, ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ আশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৩৪. তাবলীগের রেসালাত, ১০ম খণ্ড, পৃ-১২০

চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু অসুস্থতা ক্রমাগত বেড়েই চলে। অবশেষে ২৬শে মে মঙ্গলবার দিন তিনি ইন্তেকাল করেন। মির্যা সাহেবের শ্বশুর মীর নাসির নওয়াব সাহেবের বর্ণনা :

"হযরত মির্যা সাহেব যে রাতে অসুস্থ হন, ঐ রাতে আমি আমার বাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়ি। যখন তার বড়ই কষ্ট হচ্ছিল তখন আমাকে জাগানো হয়। আমি তার কাছে গিয়ে পৌছলে তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন : মীর সাহেব, আমার সংক্রামক কলেরা হয়েছে। এর পর আমার জানামতে তিনি স্পষ্ট কোন কথা আর বলেননি। এমনিভাবে দ্বিতীয় দিন দশটার পর তিনি ইন্তেকাল করেন।[৩৫]

লাশ কাদিয়ানে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯০৮ সনের ২৭ শে মে দাফনের কাজ সম্পন্ন হয়। হাকীম নুরুদ্দীন সাহেব ভেয়রবী খলীফা এবং স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হন।

---

৩৫. হায়াতে নাসির– শায়খই য়া'কুব আলী ইরফানী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব ভেয়রবী

কাদিয়ানী আন্দোলনের ইতিহাসে, গুরুত্ব ও নেতৃত্বের দিক থেকে মির্যা সাহেবের পরেই হাকীম নুরুদ্দীন ভেয়রবী সাহেবের স্থান। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, হাকীম সাহেব এই সিলসিলায় 'মস্তিস্ক'র স্থান রাখেন। আর তার অস্তিত্বই এই আন্দোলনের জ্ঞান ও চিন্তাজগতের উৎস।

শিক্ষা ও ক্রমবিকাশ

হাকীম নূরুদ্দীন[১] সাহেব হিজরী ১২৫৮ (১৮৪১ ঈসায়ী) সনে ভেয়রা (জেলা ছারগোধা, সাবেক শাহপুর, পাঞ্জাব) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন। এ হিসাব অনুযায়ী তিনি ১৮৫৭ সনে ষোল বছরের যুবক এবং মির্যা সাহেব থেকে এক বা দুই বছরের ছোট ছিলেন। তাঁর পিতা হাফেজ গোলাম রসূল সাহেব ছিলেন ভেয়রার এক মসজিদের ইমাম। তাঁর জীবনীতে বলা হয়েছে, তিনি ফারুকী বংশের লোক।

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা নিজ বাড়িতে হয়েছে। নিজের মাতার কাছে তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় ফেকাহর কিতাবাদি পড়েন। অতঃপর শৈশবেই লাহোর চলে গেছেন। সেখানে মুনশী মুহাম্মদ কাসেম কাশমীরীর কাছে ফারসী এবং মির্যা ইমাম 'বাইরবী'র কাছে কিছু হাতের লেখা শিখেছেন। তবে এ দুই বিদ্যার প্রতি তার কোন ঝোঁক ছিল না। তার এ দু'জন ওস্তাদ ছিলেন শিয়া। হিজরী ১২৭২ সনে তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন।

---

১. আকবর শাহ্ খান নজীবাবাদী লিখিত "মেরকাতুল ইয়াকীন ফী হায়াতে নূরুদ্দীন" গ্রন্থ থেকে হাকীম সাহেবের জীবনী সংগ্রহ করা হয়েছে। এ জীবনী স্বয়ং হাকীম সাহেবকে শোনানো হয়েছে। বহু গ্রন্থ প্রণেতা, আকবার শাহ খান সাহেবও যিনি তখন হাকীম সাহেবের ভক্ত এবং শাগরেদ ছিলেন– তা লিপিবদ্ধ করেন।

কিছু দিন তিনি মিয়া হাজী শরফুদ্দীনের কাছে কিছু লেখাপড়া করেছেন। এ সময়ই তিনি নিয়মিত আরবী শিখতে শুরু করেন। হযরত সাইয়েদ আহমদ সাহেবের মুজাহিদীনের সাথে সম্পৃক্ত এক কিতাব ব্যবসায়ীর প্রভাবে তাঁর কুরআনের তরজমা পড়ার আগ্রহ হয়। এরপর তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে 'তাকবিয়াতুল ঈমান' ও 'মাশারেকুল আনওয়ার' পড়েন। কিছুদিন পর লাহোরে এসে তিনি যৎসামান্য চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রাথমিক শিক্ষার সময়ই তিনি ১৮৫৮ সনে রাওয়ালপিণ্ডির নর্মাল স্কুলে চাকরি নেন। তিনি পড়াতেন ফারসী। নিজে এক মাষ্টারের কাছে অংক এবং ভূগোল পড়তেন। পরে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'পাণ্ডদাদন খাঁ'য় হেড মাষ্টার নিযুক্ত হন এবং দ্বিতীয় বার আরবী শিক্ষা শুরু করেন। চার বছর পর চাকরি ছেড়ে দেন এবং নিজের শিক্ষার দিকে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন। কিছুদিন মৌলবী আহমদ উদ্দীন সাহেব (যিনি সরল কাজী সাহেব নামে মশহুর ছিলেন)-এর কাছে পড়েছেন। তারপর ইলমের সন্ধানে হিন্দুস্তান সফর করেন এবং রামপুরে শিক্ষা শুরু করেন। সেখানে মাওলানা হাসান শাহ সাহেবের কাছে মেশকাত শরীফ, মৌলবী আযীযুল্লাহ আফগানী সাহেবের কাছে শরহে বেকায়া, মাওলানা এরশাদ হোসাইন সাহেবের কাছে উসুলুশ শাশী ও মায়বুযী, মৌলবী ছা'দুল্লাহ সাহেবের কাছে 'দেওয়ানে মুতানাব্বী,' মৌলবী আবদুল আলী সাহেবের কাছে 'সদরা' ইত্যাদি এবং মানতেক শাস্ত্রের উপর স্তরের কিতাবসমূহ যথা : 'মীর যাহেদ রেসালাহ' ও 'মীর যাহেদ মোল্লা জালাল' পড়েছেন। এ সময়ে হাকীম সাহেবের-মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর সাহায্য করার বড় উৎসাহ ছিল। কখনো কখনো তিনি নিজের ওস্তাদের সাথে নির্ভয়ে কথা বলতেন। অতঃপর রামপুর থেকে হাকীম সাহেব লক্ষ্ণৌ আসেন এবং এখানে বিখ্যাত চিকিৎসক হাকীম আলী হোসাইন সাহেবের কাছে চিকিৎসা শাস্ত্র শিখতে শুরু করেন। হাকীম আলী হোসাইন যখন নওয়াব কালব আলী খান মরহুমের আহবানে রামপুর চলে যান, তখন হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবও তাঁর সাথে ছিলেন। রামপুর অবস্থানকালে নূরুদ্দীন সাহেব মুফতী ছা'দুল্লাহ সাহেবের কাছে উচ্চতর সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেন। হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব হাকীম আলী হোসাইন লখনৌবীর খেদমতে সর্বমোট দুই বছর কাটান। অতঃপর রামপুর থেকে আরবী সাহিত্য ও দরসে হাদীসের আগ্রহে তিনি ভুপালে চলে আসেন। বিশিষ্ট

ওলামায়ে কেরামের উপস্থিতি ও বিত্তশালী আমীরদের আর্থিক সহযোগিতার ফলে ভুপাল তখন এক বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে মুনশী জামালুদ্দীন খান সাহেব তার পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং নিজের কাছে রাখেন। ভুপালে তিনি মাওলানা মুফতী আবদুল কাইউম সাহেবের (হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর খলীফা হযরত মাওলানা আবদুল হাই বোরহানবী সাহেবের ছেলে) কাছে বুখারী শরীফ এবং হেদায়া পড়েন। অবশেষে ভুপাল থেকে তিনি ইলমের পূর্ণতা ও সাফল্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় হারামাইন শরীফাইনে যাওয়ার ইচ্ছা করেন।[২]

হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব মক্কা শরীফে শায়খ মুহাম্মদ খাযরাজীর কাছে আবু দাউদ শরীফ, সাইয়েদ হোসাইন সাহেবের কাছে মুসলিম শরীফ এবং মাওলানা রহমতুল্লাহ কীরানবী ('এজহারুল হক' রচয়িতা)-এর কাছে মুসাল্লামুছ ছুবুত পড়তে শুরু করেন। তিনি কখনো কখনো ওস্তাদদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতেন। এতে তাঁর কারুর মতামত অনুসরণ না করার এবং একমাত্র নিজের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রবণতা প্রকাশ পেত।[৩]

হাকীম সাহেব আবু দাউদ ও ইবনে মাজা শরীফ শায়খ মুহাম্মদ খাযরাজীর কাছে খতম করেছেন। এ সময়েই হযরত শাহ আবদুল গনী মুজাদ্দেদী (রহ.) মক্কা শরীফে তশরীফ আনেন। শাহ সাহেব যখন মদীনা শরীফে যান, তখন হাকীম সাহেবও মদীনা শরীফে গিয়ে উপস্থিত হন এবং শাহ সাহেবের হাতে বায়আত হন। শাহ সাহেবের কাছে তিনি ছয় মাস অবস্থান করেন।

---

২. এখানে একটি চমৎকার কৌতুক রয়েছে। হাকীম সাহেব নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে শুনিয়েছেন, তিনি বিদায়ের সময় মুফতী আবদুল কাইউম সাহেবকে বলেছিলেন, 'আমাকে কোন উপদেশ দিন।' উত্তরে মুফতী সাহেব বলেছিলেন, 'তুমি আল্লাহও বনবে না, রসূলও বনবে না।' মুফতী সাহেব এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ না বনার অর্থ হলো, যদি তোমার কোন ইচ্ছা পূর্ণ না হয়, তবে তুমি মন খারাপ করবে না; কেননা فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْد আল্লাহরই সেফত। আর যদি কেউ তোমার ফতওয়া না মানে, তবে তাকে জাহান্নামী মনে করবে না, কেননা এটা রাসূল (সা.)-এর সিফত যে, তাঁর অনুসরণ না করলে মানুষ জাহান্নামে চলে যায়। (মেরকাতুল ইয়াকীন, পৃ-৭৯)

৩. মেরকাতুল ইয়াকীন, পৃ-৯৫-৯৭।

বাড়িতে অবস্থান ও চাকরি

হাকীম সাহেব হজ্জ সমাধা করে বাড়িতে চলে আসেন। বাড়িতে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর এবং শহরের অধিবাসীদের মাঝে হাদীসের উপর আমল এবং প্রচলিত কু-প্রথা নিয়ে বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে শহরে একটা হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। তখন হাকীম সাহেবের অন্তরে মানুষের মূর্খতা ও বাড়াবাড়ি এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বের কথা অনুভব হয়। এ সময় তিনি দিল্লীতে চলে যান। সেখানে তখন লর্ড লিটনের দরবার চলছিল। সেখানে মুনশী জামালুদ্দীন খান সাহেবের সংগে দ্বিতীয় বার সাক্ষাত হয়। খান সাহেব তাঁকে ভুপালে নিয়ে যান। কিছুদিন তিনি সেখানে থেকে বাড়িতে চলে আসেন্ এবং ভেয়রায় একটি দাওয়াখানা খুলে চিকিৎসা শুরু করেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতার কথা শুনে জম্মুর মহারাজা তাঁকে নিজের ব্যক্তিগত চিকিৎসক নির্ধারণ করেন। কিছুদিন যাবত তিনি জম্মু, পুঞ্জ ও কাশমীরের জমিদারদের খেদমত করেন। হাকীম সাহেব চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শিতা, বাকচাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা দেশে খুব প্রভাব সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন। তিনি মহারাজার কাছেও বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন।

মির্যা সাহেবের সাথে পরিচয় ও সম্পর্ক

জম্মুতে অবস্থানকালে হাকীম সাহেবের মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সাথে পরিচয় হয়। মির্যা সাহেব তখন সিয়ালকোটে চাকুরীতে ছিলেন। হাকীম সাহেব ভেয়রা আসা যাওয়া করার সময় সিয়ালকোট দিয়ে অতিক্রম করতেন এবং মানসিক মিল থাকার কারণে মির্যা সাহেবের সঙ্গে গিয়ে মিশতেন।[৪]

এ পরিচয় অচিরেই বন্ধুত্বের রূপ নেয়। কিছুদিনের মধ্যেই একে অপরের মনের মানুষে পরিণত হয়ে যান।[৫] মির্যা সাহেব যখন 'বারাহীনে আহমদিয়া' রচনা করেন, হাকীম সাহেব তখন 'তাসদীকে বারাহীনে আহমাদিয়া' নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মির্যা সাহেবের প্রতি হাকীম সাহেবের ভক্তি ভালবাসা

---

৪. উভয়েরই ভিন্ন ধর্মের পুস্তকাদি অধ্যয়ন এবং আর্য সমাজ ও খ্রিষ্টানদের সাথে বিতর্ক সভা করার অত্যন্ত ঝোঁক ছিল।

৫. মকতুবাতে আহমাদিয়া, পঞ্চম খণ্ড হাকীম সাহেবের নামে লিখিত পত্রাবলী।

বেড়েই চলে। তিনি মির্যা সাহেবের হাতে বায়আত হয়ে যান। মির্যা সাহবকে তিনি নিজের পীর, মুরশিদ ও ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেন। হাকীম সাহেবের নিম্নলিখিত চিঠির মাধ্যমে মির্যা সাহেবের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার কথা অনুমান করা যায় :

"মাওলানা, মুরশিদুনা, ইমামুনা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলী জনাব, আল্লাহর কাছে আমার প্রার্থনা, সর্বক্ষণ আপনার দরবারে যেন উপস্থিত থাকতে পারি এবং যুগের ইমামকে যে উদ্দেশে মোজাদ্দেদ করে পাঠানো হয়েছে, সে উদ্দেশ্য যেন আপনার সাহচর্যে থেকে অর্জন করতে পারি। অনুমতি হলে আমি চাকরি থেকে ইস্তেফা দিয়ে দেব এবং দিন রাত আপনার খেদমতে পড়ে থাকব। অথবা যদি হুকুম হয়, তবে দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াব, মানুষকে সত্য ধর্মের দিকে আহবান করব এবং এ পথে প্রিয় প্রাণটুকু বিলিয়ে দেব। যা কিছু আমার আছে তার কিছুই আমার নয়; সব আপনার।

মুরশিদ হে! আমি যথাযথ বলছি, আমার সব ধন দৌলত যদি দীন প্রচারে উৎসর্গ হয়ে যায়, তবেই আমি ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছতে পেরেছি বলে মনে কবর। যদি ক্রেতাসাধারণ 'বারাহীন'-এর মুদ্রণ বিলম্ব হওয়ার দরুন অসন্তুষ্ট হয়, তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ খেদমতটুকু সমাধা করব; এর মূল্য পুরোপুরি আদায় করে দেব। হযরত মুরশিদ, অপদার্থ আরয করছে, যদি গ্রহণ করা হয় তবে আমার বড়ই ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আমার ইচ্ছা হলো, 'বার হীন' মুদ্রণের পুরো ব্যয়টা আমার উপর ছেড়ে দেওয়া হোক। অতঃপর বিক্রয় করার পর যে অর্থ আসবে তা আপনার প্রয়োজনে ব্যয় করা হবে। আপনার সাথে আমার সম্পর্ক হলো নেসবতে ফারূকী। এ রাস্তায় আমি নিজের সর্বস্ব ব্যয় করতে প্রস্তুত।

দোয়া করবেন, আমার মৃত্যু যেন সিদ্দীকদের মৃত্যুর ন্যায় হয়।[৬]

হাকীম সাহেব মির্যা সাহেবের প্রতি এত দৃঢ় ভক্তি পোষণ করতেন যে, যখন মির্যা সাহেব 'ফাতহে ইসলাম' ও 'তাওযীহে মারাম' রচনা করেন আর হাকীম সাহেবের তখনো কিতাবগুলো দেখার সুযোগ হয়নি, এ সময় এক ব্যক্তি হাকীম সাহেবকে বললেন, নবী কারীম (সা.)-এর পরে কি কোন নবী আসতে পারে?

---

৬. মিরকাতুল ইয়াকীন ফী হায়াতে নূরুদ্দীন, পৃ-১৭, ১৮

হাকীম সাহেব উত্তরে বললেন, না, আসতে পারে না। অতঃপর সে বলল, যদি কেউ নবুওয়তের দাবী করেন? হাকীম সাহেব বললেন, অতঃপর আমরা দেখব, সে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী! যদি সত্যবাদী হয় তবে তার কথা মেনে নেব। এ ঘটনা হাকীম সাহেব নিজেই শুনিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, এটা তো নবুওয়তের কথা, আমার বিশ্বাস হলো, যদি হযরত মসীহ মওউদ কুরআনী শরীয়ত রহিত করে নতুন শরীয়তের প্রতর্বক হওয়ার দাবী করেন, তবুও আমি অস্বীকার করব না।

কেননা, যখন আমরা বাস্তবেই বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তিনি আল্লাহ প্রদত্ত, তবে যা-ই তিনি বলবেন তা-ই সত্য হবে। আর আমরা বুঝে নেব, 'খাতামুন নাবিয়্যীন-এর অন্য কোন অর্থ হবে।[৭]

হাকীম সাহেব জম্মুতে থাকাকালেই মির্যা সাহেবের নির্দেশে খ্রিষ্টবাদের বিরুদ্ধে 'ফসলুল খেতাব' নামে চার খণ্ডে একটি কিতাব লেখেন। তিনি মির্যা সাহেবের রচনাবলী মুদ্রণ ও প্রচারের ব্যাপারে উদার মনে বহু টাকা ব্যয় করেছেন। মির্যা সাহেব একাধিক বার তাঁর কাছ থেকে বহু টাকা কর্জ নিয়েছিলেন।[৮] মির্যা সাহেব তাঁর ইসলামী জোশ, দীনের সহযোগিতা এবং সৎসাহসের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মির্যা সাহেব তাঁর সম্বন্ধে বলতেন, "কতই না ভাল হতো যদি উম্মতের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই নূরে দীন বা দীনের নূর হতো। এমনিভাবে বড়ই ভাল ছিল! যদি প্রত্যেকটি হৃদয় ইয়াকীনের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ থাকতো।"[৯]

কাদিয়ানে অবস্থান ও খেলাফত লাভ

জমিদারীর কতিপয় পদস্থ কর্মচারীর হস্তক্ষেপ এবং অন্যান্য কারণে মহারাজা হাকীম সাহেবের উপর অসন্তুষ্ট হন। ১৮৯৩ অথবা ১৮৯৪ সনে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে হাকীম সাহেব ভেয়রায় নিজ বাড়ি চলে আসেন। ভেয়রায়

---

৭. সীরাতুল মাহদী, পৃ-৯৮, ৯৯

৮. মকতুবাতে আহমাদিয়া, পঞ্চম খণ্ড, হাকীম সাহেবের নামে লেখা পত্রাবলী।

৯. মেরকাতুল ইয়াকীন।

কিছুদিন দাওয়াখানায় কাজ করার পর স্থায়ীভাবে তিনি কাদিয়ান চয়ে যান। বাকি জীবন তিনি মির্যা সাহেবের সার্বিক সহযোগিতা এবং আন্দোলনের প্রচার প্রসারে ওয়াকফ্ করে দেন।

মির্যা সাহেবের মৃত্যুর (২৬ মে, ১৯০৮ ঈসায়ী) পর তিনি মির্যা সাহেবের প্রথম খলীফা নিযুক্ত হন। মির্যা সাহেবের ভক্তরা তার হাতে বায়আত করেন। তিনি 'খলীফাতুল মসীহ আল মওঊদ' এবং 'নূরুদ্দীন আযম' উপাধি পান। মির্যা সাহেবের নবুওয়তে যারা বিশ্বাস করে না, তারা কাফের কিনা, এ ব্যাপারে অনেক দিন যাবত হাকীম সাহেবের সন্দেহ ছিল। পরিশেষে তাঁর সন্দেহ দূর হয়ে যায়, তিনি তাদের কাফের বলতে শুরু করেন।[১০] হাকীম সাহেবের খেলাফত নিয়ে কিছু ঝগড়াও হয়। কিছু লোক তার খেলাফতের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। এমন সময় তিনি একবার বলেন :

"আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমাকে আল্লাহ-ই খলীফা বানিয়েছেন। সুতরাং এখন কার শক্তি আছে, আমার কাছ থেকে এ চাদর ছিনিয়ে নিতে পারে? আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাশক্তি চেয়েছেন, তাই আমাকে তোমাদের ইমাম ও খলীফা বানিয়েছেন। আমার উপর অনুপযুক্ততার অভিযোগ আনলে তা আমার উপর নয়, আল্লাহর উপর গিয়ে লাগবে। যিনি আমাকে খলিফা বানিয়েছেন।"[১১]

অপর এক স্থানে বলেছেন : "আমাকে আল্লাহ খলিফা বানিয়েছেন। এখন তোমাদের কথায় আমি বরখাস্ত হয়ে যাব না। আর আমাকে বরখাস্ত করতে পারে এরূপ ক্ষমতা কারো নেই। আর যদি তোমরা শক্তি প্রদর্শন করো, তবে স্মরণ রেখো, আমার কাছে এমন খালেদ বিন ওলীদ রয়েছে, যে তোমাদের মুরতাদদের ন্যায় শাস্তি দেবে।"[১২]

---

১০. কালেমাতুল ফসল : মির্যা বশীর আহমদ, ষষ্ঠ অধ্যায়।

১১. রিভিউ অফ রেলিজেয কাদিয়ান, পৃ-২৩৪,খণ্ড-১৪ (কাদিয়ানী মাযহাব থেকে সংগৃহীত)

১২. 'তাশহীযুল আযহান' কাদিয়ান, খণ্ড-৯ (কাদিয়ানী মাযহাব)

মৃত্যু

হাকীম সাহেব ছয় বছর যাবত খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি আহত হয়ে শয্যাশায়ী হন। এই ব্যথায় তিনি ১৯১৪ সালের ১৩ই মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তাঁর বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে যায়।[১৩] মির্যা গোলাম আহমদের বড় ছেলে মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদকে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান।

হাকীম সাহেবের ব্যক্তিত্ব ও স্বভাব

হাকীম সাহেবের জীবনকাহিনী পাঠ করলে জানা যায়, তিনি এক ব্যাকুল চিত্তের অধিকারী ছিলেন। জীবনের একটি বৃহৎ অংশে তিনি মানসিকভাবে দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলেন। প্রথম থেকে তার মাঝে জ্ঞানের প্রতি ভক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে তিনি চার মাযহাবের শৃংখল থেকে আযাদ হয়ে যান। এ ব্যাপারে তার বাড়াবাড়িও ছিল। এরপর তিনি মরহুম স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁর অন্তর স্যার সৈয়দের শিক্ষা ও চিন্তাধারা পুরোপুরি আয়ত্ত করে ফেলে। এ সময়ই ভারতবর্ষে দর্শন ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের জোয়ারের ঢেউ লাগে এবং ভারতীয় মুসলমানের একটা বিশেষ শ্রেণী এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। যারা দীনের দিকে ঝুঁকেছিল তারা দীনী মাসআলা মাসায়েল এবং কুরআনের বর্ণনা ও শিক্ষাকে আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ বর্ণনার সাথে মিশাতে চাইল। সহজভাবে মিশানো না গেলে কুরআনের আয়াত ও শব্দের মনগড়া বিশ্লেষণ পেশ করার চেষ্টা করল।

হাকীম সাহেবের দরসে তাফসীর ছিল এ ধরনের চিন্তাধারার এক নমুনা।[১৪]

মির্যা বশীর আহমদ 'সীরাতুল মাহদী' গ্রন্থে লিখেছেন, 'প্রথম খলীফা হযরত নুরুদ্দীন সাহেব শুরুতে স্যার সৈয়দের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন,

---

১৩. 'আলফযল', ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২ ঈসায়ী (কাদিয়ানী মাযহাব)

১৪. হাকীম সাহেবের দরসে তরবিয়তপ্রাপ্ত মৌলবী মুহাম্মদ আলী লাহোরীর 'বয়ানুল কুরআন' গ্রন্থে এর বাস্তব নমুনা পাওয়া যায়।

কিন্তু হযরতের সাহচর্যে থাকার কারণে এ প্রতিক্রিয়া ক্রমান্বয়ে দূর হয়ে যায়।[৫] কিন্তু হাকীম সাহেবের চিন্তাধারা অধ্যয়ন এবং তার ছাত্রদের গবেষণা দ্বারা জানা যায়, স্যার সৈয়দের প্রতিক্রিয়ায় হোক কিংবা নিজের অস্থির চিত্ততার কারণে হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁর মাঝে এ প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান ছিল। আর তার মন মগজ এই ছাঁচে পূর্ণভাবে ঢালাই ছিল।

হাকীম সাহেবের ব্যক্তিত্ব ও জীবনী অধ্যয়ন করলে এ কথাও জানা যায়, আধুনিকতা ও যুক্তিবাদী মন মানসিকতার সাথে সাথে তার মাঝে বিশ্বাস ও দীনের প্রতি অনুরাগেরও বীজ উপ্ত ছিল। যুক্তিবাদের পাশাপাশি তিনি এলহাম এবং স্বপ্ন দ্বারাও প্রভাবিত হতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আধুনিকতা এবং চিন্তাধারার স্বাধীনতার পাশাপাশি এক-ই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস এবং অন্য কিছুর প্রতিক্রিয়া দ্রুত গ্রহণ করার অভ্যাসও পুরোপুরি পাওয়া যায়। এক-ই ব্যক্তিকে দেখা যায়, কোন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে উন্নত শির এবং শেষ পর্যন্ত সংগ্রামী থাকে; আবার অপর কোন ব্যক্তি বা দাওয়াতের পদতলে মাথা লুটিয়ে দেয় এবং নিজের সকল চিন্তাশক্তিকে একদম স্থবির ও নিশ্চল করে তোলে। মানুষের যিন্দেগীতে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার এক অপূর্ব সমাহার দেখা যায়। মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিপরীতধর্মী নানা রকম পদার্থের সমষ্টি বলে মনে হয়। ফলে মানুষকে আর একা মনে হয় না; মনে হয়, বিপরীতমুখী ব্যক্তিত্বের সমষ্টি। মানুষের ব্যক্তিত্ব, উদ্দেশ্য এবং আগ্রহ বোঝা যত কঠিন, দুনিয়ার অন্য কিছু বোঝা তত কঠিন নয়।

---

১৫. সীরাতুল মাহদী, খ-১, পৃ-১৫৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

মির্যা গোলাম আহমদ : বিশ্বাস এবং দাবীসমূহের ক্রমধারা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মির্যা সাহেব : লেখক ও ইসলাম প্রচারক হিসেবে লেখালেখি এবং বিতর্ক সভার ময়দানে

মির্যা গোলাম আহমদ সাহবের ব্যাপারে এ পর্যন্ত আমাদের ধারণা এই হয়েছে যে, তিনি গুরুদাসপুর জেলার একটি গ্রামে ধর্মীয় কিতাবাদি অধ্যয়নে গভীরভাবে লিপ্ত ছিলেন। ১৮৮০ সনের পর তাঁর যে সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে, থেকে ধারণা করা যায়, তাঁর অধ্যয়নের মূল বিষয় ছিল ধর্মীয় গ্রন্থ, বিশেষ করে খ্রিষ্টধর্ম, সনাতন ধর্ম ও আর্য সমাজের গ্রন্থাবলি।

তখন ছিল ধর্মীয় বিতর্ক সভার যুগ। আলেম সমাজের এক শ্রেণীতে বেশি উৎসাহ ছিল ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং একে অপরের সাথে বিতর্ক সভার। আগেই বলা হয়েছে, খ্রিষ্টান পাদ্রীগণ খ্রিষ্টধর্ম প্রচার এবং ইসলামের বিরোধিতায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল। রাষ্ট্রীয় ধর্ম খ্রিষ্টবাদ হওয়ায় তখনকার সরকারও খ্রিষ্টান পাদ্রীদের পৃষ্ঠপোষকতা করত। ওরা হিন্দুস্তানকে যীশুর দান বা পুরস্কার মনে করত। অপর দিকে আর্য সমাজের প্রচারকগণ অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ইসলামের বিরোধিতা করে আসছিল। ইংরেজদের পলিসি এই ছিল, তারা এ ধরনের ধর্মীয় সংঘাতকে আরো উপৎসাহিত করত। কেননা, এতে দেশে একটা অন্তর্দ্বন্দের সৃষ্টি হতো। আর সকল ধর্মের কাছে এরকম শক্তিশালী হুকুমতের অস্তিত্ব গনীমত বলে মনে হতো, যে হুকুমত সকলকে হেফাজত করে এবং যার ছায়ায় নিরাপদে তর্ক বিতর্কের সভা করা যায়। এরকম পরিস্থতিতে যে ব্যক্তি ইসলামের পক্ষে বলিষ্ঠ ঝাণ্ডা নিয়ে দণ্ডায়মান হয়, সে সকলের ভক্তি ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

মির্যা সাহেবের দূরদর্শী অন্তর এ ময়দানকে নিজের কর্মের জন্য নির্বাচন করে নিল। তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনার মনস্থ করলেন। যাতে যুক্তির নিরিখে প্রমাণ করা হবে : ইসলামের সত্যতা, কুরআনী মুজেযা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়ত। আর একই সাথে অসারতা প্রমাণ করা হবে খ্রিষ্টবাদ, সনাতন ধর্ম, আর্য সমাজ এবং ব্রাহ্ম সমাজের। তিনি এ গ্রন্থের নাম রাখলেন 'বারাহীনে আহমদিয়া'।

'বারাহীনে আহমদিয়া' এবং মির্যা সাহেবের চ্যালেঞ্জ

'বারাহীনে আহমদিয়া'র রচনা শুরু হয় ১৮৭৯ সনে।[১] লেখক যিম্মাদারী নিয়েছিলেন, তিনি এ গ্রন্থে ইসলামের সত্যতার পক্ষে তিনশ'টি দলীল পেশ করবেন। মির্যা সাহেব দেশের অপরাপর বিখ্যাত মনীষী ও লেখকদের কাছে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নিয়ে চিঠিপত্র লিখেছিলেন। তিনি তাদের কাছে আবেদন করেছিলেন, নিজেদের চিন্তাধারা এবং বিষয়বস্তু লেখে পাঠানোর জন্য যেন এ গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য নেওয়া যায়। যারা মির্যা সাহেবের আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন, স্যার সৈয়দের 'বযমে এলমী'র বিশিষ্ট সদস্য মৌলবী চেরাগ আলীও তাদের একজন। মির্যা সাহেব তাঁর বিষয়বস্তু এবং গবেষণাকেও গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।[২]

শেষ পর্যন্ত এ গ্রন্থখানি শত সহস্র মানুষ যার প্রতীক্ষায় ছিল, চার খণ্ডে (বড় আকারের ৫৬২ পৃষ্ঠা) ছেপে বের হয়। এ গ্রন্থটির সাথে লেখক উর্দু, ইংরেজি ভাষায় একটি বিজ্ঞাপনও প্রচার করেন। এ বিজ্ঞাপনটি তিনি দেশের সুলতান, গভর্নর, মন্ত্রী-মিনিষ্টার, পাদ্রী ও পণ্ডিতদের কাছে প্রেরণ করেন। এ বিজ্ঞাপনে প্রথম প্রকাশ করেন, তিনি ইসলামের সত্যতা জাহির করার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত। আর তিনি সকল ধর্মের লোকদের আশ্বস্ত করতে প্রস্তুত। এ বিজ্ঞাপনে স্পষ্টভাবে বলা হয়–

"এ সহায়হীন ব্যক্তি ('বারাহীনে আহমদিয়া'র রচয়িতা) আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছ থেকে নির্দেশিত যে, নবীয়ে ইসরাঈলী (হযরত মসীহ)-এর প্রদর্শিত নীতি অনুযায়ী পুরোপুরি নিঃস্ব রিক্ত, সম্বলহীন অবস্থায় মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করবে। আর যারা পথহারা তাদের সঠিক পথের (যে পথে চলা দ্বারা সত্যিকার অর্থে মুক্তি অর্জিত হয় এবং এ পৃথিবীতে বেহেশতী যিন্দেগীর নূর দেখা যায়) সন্ধান দেবে। এ মহৎ উদ্দেশেই 'বারাহীনে

---

১. সীরাতুল মাহদী, খ-২, পৃ-১৫১

২. তবে গ্রন্থের কোথাও তার উদ্ধৃতি নেই। ডঃ আবদুল হক সাহেব স্বীয় গ্রন্থ "চান্দ হাম আসর" পৃ-৫৩, ৫৫-এ এবং ডঃ স্যার মুহাম্মদ ইকবাল একটি নিবন্ধে এর আলোচনা করেছেন।–(হরফে ইকাল পৃ-১৩১)

আহমদিয়া' গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যার ৩৭ অংশ ছেপে বের হয়েছে। গ্রন্থটির সারাৎসার সাথের চিঠিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু যেহেতু পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ হওয়া সময় সাপেক্ষ, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে এ চিঠিটি ইংরেজি বিজ্ঞাপনের সাথে প্রকাশ করা হবে। আর এর এক এক কপি পাঞ্জাব, হিন্দুস্তান ও ইংল্যাণ্ডসহ যেসব স্থানে চিঠি পৌছানো সম্ভব হয় সে সব দেশের সম্মানিত পাদ্রী, ব্রাহ্মণ, আর্য, প্রকৃতিবাদী ও মৌলবী সাহেব, যারা অলৌকিক বিষয়াবলী অস্বীকার আর এ কারণে আমার উপর কু-ধারণা পোষণ করেন, তাদের কাছে পাঠানো হবে।[৩]

এ গ্রন্থের কোন উপমা পেশ করার ব্যাপারে তিনি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন। ঘোষণা করেছেন, যে কোন ধর্মের প্রতিনিধি যেন স্বধর্মের সত্যতার পক্ষে এ পরিমাণ বা তার চেয়ে কিছু কম যুক্তি পেশ করে। 'বারাহীনে আহমদিয়া'র শুরুতে তিনি লেখেছেন :

"আমি 'বারাহীনে আহমদিয়া'র লেখক দশ হাজার টাকা পুরস্কারের বিনিময়ে, অন্য সকল ধর্মের যারা কুরআনের সত্যতা ও মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়তকে অস্বীকার করেন, তাদের বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি প্রদানপূর্বক ঘোষণা করছি, অবিশ্বাসীদের মধ্যে থেকে যদি কেউ কুরআন ও শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়তের সত্যতার পক্ষে যে পরিমাণ যুক্তি আমি পেশ করেছি, সে পরিমাণ যুক্তি, সম্ভব না হলে তার অর্ধেক পরিমাণ, তাও সম্ভব না হলে এক তৃতীয়াংশ, তা-ও অসম্ভব হলে এক চুতর্থাংশ, তাতেও অপারগ হলে এক পঞ্চমাংশ যুক্তি পেশ করতে পারেন, অথবা যদি প্রমাণ পেশ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হন, তবে আমার প্রমাণগুলো খণ্ডন করে দিতে পারেন, তবে আমি জওয়াব প্রদানকারীকে আমার দশ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তির উপর দখল দিয়ে দেব।"[৪]

মির্যা সাহেব মুসলমানদের ইসলামের এ বৃহত্তর খেদমতে আর্থিক সহযোগিতা এবং উদারতার সাথে অংশ গ্রহণ করার আহবান জানিয়েছিলেন।[৫]

---

৩. মে'রাজুদ্দীন ওমর কাদিয়ানী সংকলিত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী, যা 'বারাহীনে আহমদিয়া'র প্রথম খণ্ডে (পৃ-৮২) অন্তর্ভুক্ত।

৪. বারাহীনে আহমদিয়া, প্রথম খণ্ড পৃ-১৭ থেকে ২২

৫. বারাহীনে আহমদিয়া, লেখকের জরুরী বিজ্ঞপ্তি।

মনে হয়, তিনি যত উৎসাহ নিয়ে মুসলমানদের আহবান করেছিলেন, ততটুকু উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মুসলিমগণ তার ডাকে সাড়া দেয়নি। 'বারাহীনে আহমদিয়া'র পরের খণ্ডগুলোতে তিনি এর জন্য আক্ষেপ করেছেন।[৬]

এসব প্রচারপত্র ছিল গ্রন্থের পূর্বকথা এবং মির্যা সাহেবের যিন্দেগীর আগাম সংকল্পের ভূমিকাস্বরূপ। এতে বলিষ্ঠ প্রত্যয়, মানুষের অন্তরকে আশ্বস্ত করা এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আসমানী নিশানার উপর নির্ভরতা পরিলক্ষিত হয়। এর পাশাপাশি এ সব প্রচারপত্রগুলোতে কিছু পরিমাণ ব্যবসায়ী বুদ্ধিও ঝলকে উঠে।

মির্যা সাহেব 'বারাহীনে আহমদিয়া'র তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের শুরুতে "ইসলামী সংগঠনগুলোর খেদমতে নিবেদন : মুসলমানের নাযুক অবস্থা ও ইংরেজ গভর্নমেন্ট" শিরোনামে খোলাখুলিভাবে ইংরেজ সরকারের প্রশংসা করেছেন এবং মুসলমানের উপর তাদের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি জোরালোভাবে এ কথার আপীল করেছেন যে, সকল ইসলামী সংগঠনগুলো মিলে একটি ম্যামোরেন্ডাম তৈরি করে এর উপর নেতৃস্থানীয় সকল মুসলমান দস্তখত করে যেন সরকারের কাছে পাঠানো হয়। এর মধ্যে তার স্বগোত্রীয় লোকদের খেদমতেরও উল্লেখ রয়েছে। এর সাথে জিহাদ নিষিদ্ধ করারও জোর দাবী করা হয়েছে।[৭]

এমনিভাবে মির্যা সাহেবের প্রথম রচনাও ইংরেজ সরকারের গুণকীর্তন এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক পরামর্শ দেওয়া থেকে মুক্ত নয়।

গ্রন্থটির পরিণতি

১৮৮০ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত এ গ্রন্থের রচনা ও প্রচারের ধারা অব্যাহত থাকে। চতুর্থ খণ্ডের পরে এই ধারা বন্ধ হয়ে যায়। পঞ্চম খণ্ড, অর্থাৎ কিতাবখানির শেষ খণ্ড রচনা করার পঁচিশ বছর পর ১৯০৫ সনে মুদ্রিত হয়।[৮]

---

৬. দ্রষ্টব্য : দ্বিতীয় খণ্ড, আরযে জরুরী বহালাতে মজবুরী।

৭. দ্রষ্টব্য : বারাহীনে আহমদিয়া, তৃতীয় খণ্ড

৮. সীরাতুল মাহদী, খ-২, পৃ-১৫৪

লেখক পঞ্চম খণ্ডে একথা স্বীকার করেছেন, দীর্ঘ তেইশ বছর যাবত এ কিতাবের মুদ্রণ মুলতবি ছিল।[৯] এ সময় বহু লোক, যারা কিতাবখানির চার খণ্ড ক্রয় করেছিল এবং পূর্ণ কিতাবের মূল্য জমা দিয়েছিল, দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। পূর্বে দাম দিয়ে ফেলেছিলেন, এমন কেউ কেউ নিজেদের অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেছিলেন, এ কারণে লেখক পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকায় কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। ভূমিকায় তিনি একথাও উল্লেখ করেছেন, প্রথমে তাঁর পরিকল্পনা ছিল, ইসলামের সত্যতার পক্ষে তিনশ'টি যুক্তি উপস্থাপন করবেন, কিন্তু এখন তিনি এ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছেন। এভাবে প্রথমে পঞ্চাশ খণ্ডে মুদ্রণের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন পাঁচ খণ্ডে শেষ করা হবে। কেননা, এ দুটো সংখ্যার মধ্যে শুধু একটি শূন্যের পার্থক্য। মির্যা সাহেব লিখেছেন :

"প্রথমে পঞ্চাশ খণ্ডে লেখার ইচ্ছা ছিল। এখন পঞ্চাশ থেকে পাঁচে সীমাবদ্ধ করা হলো। যেহেতু পঞ্চাশ ও পাঁচের মাঝে শুধু একটি শূন্যের পার্থক্য, এ জন্য পাঁচ খণ্ড দ্বারা সে ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গেছে।"[১০]

মির্যা বশীর আহমদ 'সীরাতুল মাহদী' গ্রন্থে লিখেছেন : "এখন যখন 'বারাহীনে আহমদিয়া'র চার খণ্ড মুদ্রিত পাওয়া যায়, এর অন্তর্ভুক্ত ভূমিকা এবং টীকা ইত্যাদিও প্রকাশের সময়কালের এবং এর মধ্যে মূল প্রাথমিক রচনার অংশ খুবই সামান্য, অর্থাৎ কয়েক পৃষ্ঠার বেশি নয়। এর অনুমান এভাবে করা যায়, তিনশ'টি প্রমাণ যা তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে থেকে মুদ্রিত 'বারাহীনে আহমদিয়া'য় একটি মাত্র বর্ণিত হয়েছে, তা-ও অসম্পূর্ণভাবে।"[১১]

এক নজরে গ্রন্থখানি

'বারাহীনে আহমদিয়া' যিনি অধ্যয়ন করবেন, তিনি লেখকের লেখার বাহুল্য, ধৈর্য ও পরিশ্রমে অবশ্যই প্রভাবিত হবেন। এ গুণগুলো এরূপ, এগুলো লেখককে খ্রিষ্টান এবং আর্যদের বিপরীত অতি মাত্রায় একজন সার্থক

---

৯. দ্রষ্টব্য ঃ বারাহীনে আহমদিয়া, তৃতীয় খণ্ড

১০. প্রাগুক্ত, পৃ-৭

১১. সীরাতুল মাহদী, খ-১, পৃ-৭

বিতর্ককারী এবং একজন বড় লেখক হিসেবে প্রমাণ করে, কিন্তু পাঠকের জন্য এ বিশাল ভাণ্ডারে দুর্লভ কোন সূক্ষ্ম কথা বা খ্রিষ্টবাদের মৌলিক ও পুরনো গ্রন্থাবলীর জটিল কোন গূঢ় রহস্য এমনভাবে উন্মোচিত হয় না, যেরূপ পরিলক্ষিত হয় মাওলানা রহমতুল্লাহ কীরানবীর (মৃত্যু : ১৩০৯ হি.)' এজহারুল হক' ও 'ইযালাতুল আওহাম' ইত্যাদি গ্রন্থে। তাছাড়া সে রকম ভাষার মাধুর্য এবং বর্ণনাভঙ্গির অভিনবত্বও পাওয়া যায় না যা, 'তাকরীরে দেল পুযীর-এর রচয়িতা 'হুজ্জাতুল ইসলাম' মাওলানা কাসেম নানুতবীর (মৃত্যু : ১২৯৭ হি.) লেখার বৈশিষ্ট্য।

স্বর্গীয় নির্দেশ ও দাবী দাওয়া

এ গ্রন্থে এত বেশি পরিমাণ স্বর্গীয় নির্দেশ, অলৌকিক বিষয়, আল্লাহর সাথে কথোপকথন, ভবিষ্যদ্বাণী ও দীর্ঘ দাবী দাওয়া পাওয়া যায়, যা দ্বারা পাঠকের মন বিরক্ত হয়ে ওঠে। গ্রন্থখানি একটি পবিত্র ও সুন্দর ইলমী আলোচনার পরিবর্তে একটি আত্মপ্রচারমূলক রচনায় পরিণত হয়েছে। যার মাঝে লেখক আপন ব্যক্তিত্বের খোলাখুলি প্রচার করেছেন। আর স্থানে স্থানে এর ঢুগঢুগি বাজিয়েছেন।

গ্রন্থখানির মূল আলোচ্য বিষয় এবং সারাংশ হচ্ছে, এলহাম বা ঐশী নির্দেশের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়নি এবং বন্ধ হওয়া উচিতও নয়। ধর্ম বিশ্বাসের সত্যতা এবং এ দাবীর সত্যতার সবচাইতে বড় প্রমাণ এই এলহাম। যে ব্যক্তি রসূল (সা.)-এর পুরোপুরি অনুসরণ করবে, তাকে জাহেরী বাতেনী জ্ঞান দ্বারা সম্মানিত করা হয়। যা মূলত নবীগণকে দেওয়া হয়েছিল। আর সে ব্যক্তির ইলমে ইয়াকীনী বা নির্ভুল জ্ঞান অর্জিত হয়। তাকে খোদা প্রদত্ত এ জ্ঞান নবীগণের জ্ঞানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এদেরই হাদীস শরীফে 'আমছাল' এবং কুরআন শরীফে 'সিদ্দীক' শব্দ দ্বারা স্মরণ করা হয়েছে। তাঁদের আত্মপ্রকাশের সময় আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমনের সময়কালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁদের দ্বারাই ইসলামের অকাট্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁদের এলহাম-ই নির্ভুল এলহাম।[১২] এলহামের ধারা যে আজো বন্ধ হয়নি, তার নমুনাস্বরূপ তিনি

---

১২. বারাহীনে আহমদিয়া, খ-৩, পৃ-২৩১ ও ২৪৪ সংক্ষেপিত

নিজের এলহামসমূহের এক সিলসিলা বর্ণনা করেছেন। 'বারাহীনে আহমদিয়া'য় তিনি লিখেছেন : "এ এলহামের উদাহরণ আমার কাছে অনেক রয়েছে। তবে যেটা এ টীকা লেখার সময়, অর্থাৎ ১৮৮২-এর মার্চে হয়েছে, তা হলো, ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ এ গায়েবী কথা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ প্রচারমূলক গ্রন্থ দ্বারা এবং বিষয়বস্তুর উপর অবহিত হওয়া দ্বারা পরিণামে বিরুদ্ধবাদীদের সুস্পষ্ট পরাজয় আসবে, আর সত্যসন্ধানীদের পথের সন্ধান মিলবে এবং বিভ্রান্তি দূর হবে, আর মানুষ আল্লাহ তায়ালার গোপন ইঙ্গিতে সাহায্য করবে এবং ঝুঁকে পড়বে, ইত্যাদি।"[১৩]

এরপর মির্যা সাহেব সেই দীর্ঘ এলহাম উদ্ধৃত করেছেন, যার সবটাই প্রায় কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সামঞ্জস্যহীন টুকরোর সমষ্টি। এ এলহাম 'বারাহীনের' প্রায় চল্লিশ ছত্রে পরিব্যাপ্ত। এ চল্লিশ লাইন প্রায় ৫৩/৫৪ আয়াতের অংশ। মাঝে মাঝে কয়েকটি হাদীসও রয়েছে। এ ছাড়া মির্যা সাহেবের বাক্যগুলো হিন্দুস্তানী আরবীর একটা নমুনাবিশেষ বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, এর শেষ কয়টি লাইন, যেখানে তুলনামূলক আয়াত কম রয়েছে, উদ্ধৃত করা হল :

كن فى الدنيا كانك غريب اوعا برسبيل وكن من
الصالحين الصديقين وامر بالمعروف وانه عن المنكر وصل
على محمد وال محمد الصلوة هرالمرلى الى رافعک الى
والقيت عليک محبة متى الاالـه الا الله فاكتب وليطبع
وليرسل فى الارض خذوا التوحيد يا ابناء الفارس؟ وبشر
الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم واتل عليهم مااوحى
اليک من ربک ولاتصعر لخلق الله ولا تسئم من الناس-
امصحاب الصفة ومادرك مااصحاب الصفة ترى اعينهم

---

১৩. বারাহীনে আহমদিয়া, খ-৩, পৃ-২৩৮

تفيض من الدمع يصلون عليک ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان وداعيا الى الله وسراجا منيرا-املوا [১৪]

এমনিভাবে চতুর্থ খণ্ডেও একটি এলহাম তুলে ধরেছেন। তাও কুরআন শরীফের আয়াত ও শব্দসমূহের সামঞ্জস্যহীন সমষ্টি। এতে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের স্পষ্ট ভুল রয়েছে।[১৫] যেহেতু মির্যা সাহেব এর তর্জমাও করেছেন, এর জন্য মূল এবারত এবং সাথে তরজমাও উদ্ধৃত করা হলো :

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا أَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّدْهِنُوْنَ؟ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ قِيْلَ ارْجِعُوْا اِلَى اللّٰهِ فَلَا تَرْجِعُوْنَ وَقِيْلَ اِسْتَحْوَذُوْا وَلَا تَسْتَحْوَذُوْنَ اَمْ تَسْئَلُهُمْ مِنْ خَرْجٍ فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ بَلْ اَتَيْنَا هُمْ بِالْحَقِّ فَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُوْنَ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ اَحَسِبَ

---

১৪. বারাহীনে আহমদিয়া, খ-৩, পৃ-১৪২, তর্জমা : দুনিয়াতে এরূপভাবে থাকো, যেরূপ থাকে মুসাফির ও পরদেশী। নেককার ও সিদ্দীকদের মধ্যে শামিল হও। সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকো। হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরদের উপর দুরূদ পাঠাও। দুরূদ সালাত-ই পালনকর্তা। নিশ্চয় আমি তোমাকে নিজের দিকে উত্তোলনকারী, আমি তোমার ভালবাসা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছি। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। সুতরাং লেখ এবং ছেপে দেওয়া উচিত এবং দেশে প্রচার করা উচিত। তাওহীদবাদী হও, তাওহীদবাদী হও, হে ইরানীরা! সুসংবাদ দাও ঐ লোকদেরকে যারা ঈমান নিয়েছে যে, তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে। আর তাদেরকে পড়ে শুনাও যা তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে ঐশীবাণী এসেছে। আর আল্লাহর মাখলুকের জন্য মুখ ফুলিওনা মানুষ থেকে বিরক্ত হয়ো না। সুফফাবাসীরা! তোমাদের কি খবর আছে? সুফফাবাসীরা তোমরা তাদের চোখগুলোকে দেখছ, অশ্রুতে পরিপূর্ণ। তোমার উপর দরূদ পাঠাচ্ছে। হে আমাদের পরয়ারদেগার! আমরা একজন আহবানকারীকে ডাকতে শুনেছি যে, ঈমানের আওয়াজ দিচ্ছে, আল্লাহর দিকে আহবানকারী হয়ে, এবং প্রজ্জ্বলিত বাতি, আশা রাখো।

১৫. ঐ সব স্থানে আমি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে রেখেছি।

النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ، يُحِبُّوْنَ اَنْ يَحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا وَلَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ خَافِيَةٌ وَلَا يَصْلَحُهٗ شَيْءٌ قَبْلَ اِصْلَاحِهٖ وَمَنْ رُدَّانَ مَطْبَعِهٖ؟ فَلَا مَرَدَّ لَهٗ۔

"এবং যখন তাদের বলা হয়, ঈমান আনো, যেরূপভাবে মানুষ ঈমান এনেছে, তখন তারা বলে, আমরা কি মূর্খদের ন্যায় ঈমান আনয়ন করব? খবরদার! ওরাই মূর্খ, তবে জানে না। আর এটা চায় যে, তোমরা তার ব্যাপারে উপেক্ষা কর। হে কাফেরেরা! আমি ঐ বস্তুর পূজা করি না যার পূজা তোমরা কর। তোমাদের বলা হয়েছে আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হও, তোমরা আকৃষ্ট হওনি। তোমাদের বলা হয়েছে, নিজেদের নফসের উপর তোমরা গালেব হয়ে যাও, তোমরা গালেব হওনি। তুমি কি তাদের কাছে কোন বেতন চাও? সুতরাং এ শাস্তির কারণে ওরা হক কবুল করা এক পাহাড় মনে করছে; বরং তাদেরকে বিনা মূল্যে সত্য দেওয়া হচ্ছে, আর ওরা সত্য অপছন্দ করছে। আল্লাহ তায়ালা ঐ সব দোষত্রুটি থেকে পাক ও উর্ধ্বে, যেগুলো ওরা তার সত্তার উপর লাগায়। ওরা কি মনে করছে, পরীক্ষা করা ব্যতীত শুধু মৌখিক ঈমানের দাবী দ্বারা ছুটে যেতে পারবে? ওরা চায় এমন সব কাজের প্রশংসা করা হোক, যা ওরা করেনি, আর আল্লাহর কাছ থেকে কোন বস্তু গোপন নেই। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোন বস্তুর সংশোধন করেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত তা সংশোধিত হয় না। আর যে ব্যক্তিকে তার ছাপাখানা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তাকে কেউ ফিরিয়ে আনতে পারে না।[১৬]

আরবী ছাড়া এ গ্রন্থে দুটি ইংরেজী এলহামও রয়েছে।[১৭]

---

১৬. বারাহীনে আহমদিয়া, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫০৯

১৭. বারাহীনে আহমদিয়া, চতুর্থ খণ্ড, পৃ-৫৫৪-৫৫৬

বারাহীনে আহমদিয়া'য় বর্ণিত মির্যা সাহেবের আকীদা

১৮৮০ সন থেকে নিয়ে ১৮৮৪ সন পর্যন্ত 'বারাহীনে আহমদিয়া'র যে চার খণ্ড বের হয়েছে, তাতে মির্যা সাহেব শুধু একটি বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে, এলহামের ধারাবাহিকতা জারি রয়েছে এবং জারি থাকবে। আর আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকার জারি রয়েছে ইলমে লাদুন্নী বা খোদা প্রদত্ত জ্ঞান এবং ইলমে ইয়াকীনী বা পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের বেলায়। এ গ্রন্থে নিজের ব্যাপারে তিনি বার বার প্রকাশ করেছেন, তিনি মানুষের সংশোধন ও ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত এবং বর্তমান যুগের সংস্কারক। আর হযরত ঈসা মসীহ (আ.)-এর সাথে তার সাদৃশ্য রয়েছে।[১৮] এ গ্রন্থে হযরত ঈসা মসীহ (আ.)-এর আসমানে উঠে যাওয়া এবং দ্বিতীয় বার অবতরণ করার কথাও স্বীকার করেছেন। খোদ মির্যা সাহেব ১৯০২ সনে রচিত 'নুযুলুল মাসীহ'-এর পরিশিষ্টে এবং ১৯০৫ সনে রচিত বারাহীনে আহমদিয়ার পঞ্চম খণ্ডে এ কথার স্বীকারোক্তি করেছেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, তিনি এ যাবত হযরত মাসীহ (আ.)-এর উঠে যাওয়া এবং পুনরায় অবতরণের প্রবক্তা ছিলেন।[১৯] বারাহীনে আহমদিয়ায় মির্যা সাহেব অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে কোন নতুন নবুওয়ত বা কোন নতুন ওহীর কথা এ জন্য অস্বীকার করেছেন, কুরআন শরীফ ও তার শিক্ষার বিকৃত হওয়ার কোন রকম ভয় নেই। আর মুসলমানের মূর্তিপূজা ও মানুষ পূজার যুগে ফিরে যাওয়ারও ভয় নেই। বরং উল্টো "কুরআনী শিক্ষা বারংবার শুনার কারণে এবং তাওহীদবাদীদের সাথে সাথে সব সময় উঠাবসার কারণে, মুশরিকদের মন কিছু কিছু তাওহীদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।" আর নবুওয়ত ও ওহীর কাজ হলো, এ দ্বিবিধ ভয়ের দরজা বন্ধ করে দেওয়া আর এ দু'য়ের ত্রুটি সংশোধন করা। এজন্য এখন কোন নতুন শরীয়ত এবং কোন নতুন এলহামের প্রয়োজন নেই। এ-ও প্রমাণিত হয়ে গেছে, রসূলুল্লাহ

১৮. সীরাতুল মাহদী, খণ্ড-১, পৃ-৩৯

১৯. নুযুলুল মাসীহ গ্রন্থের পরিশিষ্ট, পৃ-৬; বারাহীনে আহমদিয়া, খ-৫, পৃ-৮৫

(সা.) সর্বশেষ রসূল। তিনি লিখেছেন : "আর যখন কুরআন মজীদের মূলনীতিগুলোর পরিবর্তন বা বিকৃত হওয়া কিংবা সকল মানুষের উপর শিরকের অন্ধকারের প্রভাব বিস্তার অসম্ভব, তাই নতুন শরীয়ত বা নতুন এলহাম অবতীর্ণ হওয়াও অসম্ভব। কেননা, যা অসম্ভব বস্তুকে বাধ্য করে, তা-ও অসম্ভব ও দুষ্কর। সুতরাং প্রমাণিত হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই সর্বশেষ রসূল।"[২০]

গ্রন্থটির প্রতিক্রিয়া

ধারণা করা যায়, হিন্দুস্তানের অনেক ইলমী ও দীনী হালকায় এ কিতাবটিকে আগ্রহের সাথে স্বাগত জানানো হয়েছে। সত্য বলতে কি, গ্রন্থখানি ঠিক সময়েই প্রকাশ হয়েছিল। মির্যা সাহেব ও তাঁর ভক্তরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এর প্রচার করেছেন। গ্রন্থখানির সফলতা এবং এর প্রভাবের একটি কারণ এ-ও ছিল যে, এতে অপরাপর ধর্মের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল। আর গ্রন্থখানি বিশ্লেষণধর্মী বর্ণনার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে লেখা হয়েছিল। এ গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাকারীদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন বাটালবী অন্যতম। তিনি তার 'ইশাআতুস সুন্নাহ' পত্রিকায় গ্রন্থখানির একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছেন। সমালোচনাটি পত্রিকার ছয়টি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।[২১] এ সমালোচনায় গ্রন্থখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে একে বর্তমান যুগের একটি অনন্য কীর্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কিছুকাল পরেই মির্যা সাহেবের ভিত্তিহীন দাবী দাওয়া ও এলহাম সম্বন্ধে মাওলানা সন্দেহে পতিত হয়েছেন।

অবশেষে তিনি মির্যা সাহেবের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যান। পক্ষান্তরে কোন কোন আলেমের এ কিতাব থেকেই সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তাঁদের এ ধারণা হতে থাকে, এ ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করছে, অথবা অচিরেই দাবী করবে। সে সকল দূরদর্শীদের মধ্যে মাওলানা আবদুল কাদির লুধিয়ানবী মরহুমের দুই ছেলে মাওলানা মুহাম্মদ ও মাওলানা আবদুল আযীয সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

২০. বারাহীনে আহমদিয়ার টীকা, চতুর্থ খণ্ড, পৃ-১১১

২১. সপ্তম সংখ্যা, ১৮৮৪, পৃ-৬ থেকে ১১

অমৃতসরের আহলে হাদীস ওলামায়ে কেরাম এবং গযনবী হযরতদের মধ্য থেকে কয়েকজন এ এলহামগুলোর বিরোধিতা করে এগুলোকে অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করেন।[২২]

এ গ্রন্থের প্রচার প্রথম বারেই মির্যা সাহেবকে কাদিয়ানের অজ্ঞাত অখ্যাত কোণ থেকে বের করে পরিচয় ও সম্মানের মহাসড়কে এনে দাঁড় করায়। সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে নিবদ্ধ হলো। মির্যা বশীর আহমদ 'সীরাতুল মাহদী'তে যথার্থই লিখেছেন :

"বারাহীন রচনার পূর্বে হযরত মসীহ মওউদ অজ্ঞাত পরিচয় অবস্থায় জীবন যাপন করছিলেন। অবস্থা ছিল ঘরের কোণে বসা সূফীদের ন্যায়। যদিও বারাহীনের পূর্বে কোন কোন পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করার ধারাও শুরু করেছিলেন, আর এ ধরনের প্রচারের দ্বারা তার নাম সাধারণের সামনে এসেও গিয়েছিল, তবু তা ছিল সামান্য।

মূলত এককভাবে বারাহীনে আহমদিয়ার প্রচার-ই সর্বপ্রথম তাঁকে দেশের সামনে উপস্থিত করে। এভাবে জ্ঞানপিপাসু ও ধর্মভীরু শ্রেণীর সামনে তাঁর ব্যাপক পরিচয় ঘটে। আর লোকের দৃষ্টি ঔৎসুক্যের সাথে পল্লীতে অবস্থানকারী ঐ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিটির দিকে প্রসারিত হতে থাকে। যিনি এত বড় চ্যালেঞ্জ ও এত বড় পুরস্কারের ঘোষণা করে ইসলামের অকাট্যতা নিয়ে এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করার ওয়াদা করেছেন।

ইতিপূর্বে হেদায়েতের যে সূর্য উদিত হয়েছিল, এখন তা যেন দিগন্ত ছেড়ে উপরে উঠছে। এর পর বারাহীনে আহমদিয়ার প্রচার দেশের ধর্মীয় অঙ্গনে এক তুমুল ঝড় তুলল। লেখককে সাধারণ মুসলমান একজন বিশিষ্ট সংস্কারক হিসেবে অভিবাদন জানাল। আর ইসলামের শত্রুদের দুর্গেও এ গোলা বর্ষণের কারণে এক তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল।"[২৩] খোদ মির্যা সাহেব বারাহীনে আহমদিয়ার রচনার পূর্বে নিজের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন :

---

২২. 'ইশাআতুপ সুন্নাহ', জুন- ১৮৮৪

২৩. সীরাতুল মাহদী, প্রথম খণ্ড, পৃ-১০৩, ১০৪

'এটা ছিল এমন সময়, যখন আমাকে কেউ চিনত না। কোন শত্রুও ছিল না, কোন মিত্রও ছিল না। কেননা সে সময় আমি কিছুই ছিলাম না। অপরিচিত মানুষ হিসেবে এক কোণে পড়ে ছিলাম।"[২৪]

এর পর লেখেন :

'এই গ্রাম (কাদিয়ান)-এর সকলে এবং অন্যান্য হাজার হাজার মানুষ জানে, সে সময় মূলত আমি এমন মড়ার ন্যায় ছিলাম যে শত শত বছর কবরে প্রোথিত থাকে, আর কেউ জানেও না, এটা কার কবর।'[২৫]

আর্য সমাজের সাথে বিতর্ক সভা

১৮৮৬ সনে মির্যা সাহেব হোসিয়ারপুরে আর্য সমাজের মুরালী ধরের সাথে বিতর্ক সভায় অংশ গ্রহণ করেন। এ বিতর্ক সভা নিয়ে তিনি 'সুরমায়ে চশমে আরিয়া' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ধর্মীয় বিতর্ক সভা নিয়ে লেখা তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ।

প্রথম দিনে বিতর্কসভার আলোচ্য বিষয় ছিল, "চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুজেযার আকলী ও নকলী প্রমাণ।" মির্যা সাহেব এ গ্রন্থে শুধু এ মুজেযাই নয়, বরং প্রমাণসহ আম্বিয়ায়ে কেরামের সকল মুজেযার পক্ষে আলোচনা করেছেন। তিনি প্রমাণ করেন, মুজেযা এবং অলৌকিক বিষয় যুক্তিযুক্তভাবে হওয়া সম্ভব। মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও পরীক্ষার এ অধিকার নেই যে, একে অস্বীকার করে। তিনি বার বার এ কথার উপর জোর দিয়েছেন, মানুষের জ্ঞান সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ, অথচ সম্ভাব্য বস্তু অনেক বেশি।[২৬] এ কথার উপরও তিনি খুব জোর দিয়েছেন যে, ধর্ম ও আকীদা-বিশ্বাসের জন্য অদৃশ্যে বিশ্বাস করা অত্যন্ত জরুরি। আর ধর্ম ও যুক্তির মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। সত্য হলো, পরবর্তীতে তিনি হযরত মসীহের শত শত বছর আসমানে থাকার উপর যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, এক কথায়, পরবর্তী সময়ে তিনি যে অনেকটা যুক্তির প্রতি ঝুঁকে

---

২৪. হাকীকতুল ওহীর পরিশিষ্ট, পৃ-২৭, ২৮

২৫. প্রাগুক্ত- পৃ-২৮

২৬. সুরমায়ে চশমে আরিয়া, পৃ-১৫৭

গিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে লেখকের এ গ্রন্থটি একটি সমুচিত প্রতিবাদ। এ গ্রন্থে লেখকের যে ব্যক্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়; পরবর্তী গ্রন্থগুলোতে সে ব্যক্তিত্ব আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

চিন্তাধারার পরিবর্তন

এ দুটি গ্রন্থ লেখার পর মির্যা সাহেবের নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। তিনি জানতে পেরেছেন, তাঁর মাঝে লেখনী শক্তি ও বিতর্কমূলক আলোচনার যোগ্যতা রয়েছে। নিজের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতাকে প্রভাবিত করা এবং একটি নতুন আন্দোলন পরিচালনা করার মত যোগ্যতাও তাঁর আছে; একথাও তিনি অনুমান করতে পেরেছেন। সম্ভবত এ অভিজ্ঞতাই তাঁর মনে এক নতুন পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। এখন খ্রিষ্টান ও আর্যদের সাথে বিতর্ক সভা করার পরিবর্তে খোদ মুসলমানদের বিতর্ক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবান জানানোর প্রতি তার মন ঝুঁকে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মসীহ মওউদ হওয়ার দাবী

মির্যা সাহেব ও হাকীম সাহেবের মাঝে সম্পর্ক

আগের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা জানতে পেরেছি, হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব চাকরিরত অবস্থায় জম্মুতে অবস্থান করছিলেন। এ সময়েই মির্যা সাহেব সিয়ালকোট জিলার হাকিমের কাছে চাকরিরত ছিলেন। উভয়ের মাঝে মানসিক ও চাহিদাগত মিল ছিল। উভয়েই ধর্মীয় বিতর্ক ও আলোচনায় আগ্রহী এবং উচ্চ ধারণার লোক ছিলেন। মনে হয়, তাঁদের উভয়েই একে অপরের ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আমরা দেখেছি, তাঁদের মাঝে ১৮৮৫ সন থেকে চিঠিপত্রের আদান প্রদান শুরু হয়েছে। মির্যা সাহেবের পত্রাবলীর মধ্যে হাকীম সাহেবের নামে লেখা প্রথম চিঠিটি ১৮৮৮ সনের ৮ই মার্চ তারিখের। এ চিঠিপত্র বরাবর চলতে থাকে। উভয়ে ঘরোয়া ও পারিবারিক বিষয়েও একে অপরের সাথে পরামর্শ করেন। মির্যা সাহেব হাকীম সাহেবের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে ১৮৮৮ সনের জানুয়ারীতে কাশ্মীর সফর করেন। একমাসকাল তিনি হাকীম সাহেবের কাছে অবস্থান করেছেন। মির্যা সাহেব বরাবর হাকীম সাহেবকে স্বর্গীয় নির্দেশ, সুসংবাদ ও অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানের কথা জানান। তিনি হাকীম সাহেবের কাছে ওলামায়ে কেরামের বিরোধিতা ও কাফের ফতোয়া দেওয়ারও অভিযোগ করেন। ১৮৯০ সনের ১৫ই জুলাইর এক চিঠিতে তিনি হাকীম সাহেবকে লিখেছেন : 'এবং আমি শুনেছি ওরা নীচু স্বরে কাফের বলতে শুরু করেছে। এতে জানা যায়, আল্লাহ তায়ালা একটি বড় বিষয় প্রকাশ করতে চাইছেন।'[১]

১৮৯০ সন পর্যন্ত মির্যা সাহেবের দাবী

এ যাবত মির্যা সাহেব শুধু সংস্কারক ও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হওয়ার দাবী করেছেন। 'সীরাতুল মাহদী'র লেখক (মির্যা বশীর আহমদ সাহেব)-এর কথা অনুসারে মির্যা সাহেব শুধু এতটুকু বলতেন : "আমাকে মানুষের সংশোধনের জন্য মসীহের রঙে দাঁড় করানো হয়েছে। মসীহের সাথে

---

১. মকতুবাতে আহমদিয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃ-৭৯

আমার সাদৃশ্য রয়েছে।"[২] তিনি বারাহীনে আহমদিয়ায় এ ধারণার প্রকাশ করেছেন যে, দীনে ইসলামের পূর্ণ বিজয়ের যে ওয়াদা–

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

আয়াতে করা হয়েছে, মসীহ মউউদের মাধ্যমে তা প্রকাশ পাবে; যার দ্বিতীয় বার দুনিয়ায় আসার সংবাদ হাদীসে দেওয়া হয়েছে। তিনি শুধু হযরত মসীহ মউউদের প্রথম যিন্দেগীর নমুনা। তিনি লেখেন :

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ

এ আয়াতটি শারীরিক ও রাজ্য পরিচালনার দিক থেকে হযরত মসীহ মওউদ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। আর দীনে ইসলামের যে পরিপূর্ণ বিজয়ের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, এ বিজয় হযরত মসীহ মওউদের মাধ্যমে অর্জিত হবে। আর হযরত মসীহ মওউদের যখন দ্বিতীয়বার আবির্ভাব ঘটবে, তখন তাঁর হাতে দীনে ইসলাম সকল প্রান্তে ছড়িয়ে যাবে, কিন্তু এই দুর্বলের উপর প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ অপদার্থ স্বীয় দরিদ্রতা, নিঃস্বতা, আল্লাহর উপর আস্থাশীলতা, বদান্যতা ও নিদর্শনাবলীর দিক থেকে মসীহ মওউদের প্রথম যিন্দেগীর নমুনা। এ অভাগার স্বভাব ও হযরত মসীহ মওউদের স্বভাব খুবই কাছাকাছি। যেন এক-ই মুক্তার দুই টুকরো অথবা অথবা একটি গাছের দুটো ফল। আর কোন কোন দিক থেকে সম্পূর্ণ এক, যেমন ঐশী নির্দেশের দিক থেকে সামান্যই পার্থক্য।[৩]

একটি জরুরী পরামর্শ

ঈসায়ী ১৮৯১ সাল। এ বছরটি মির্যা সাহেবের জীবন ও কাদিয়ানী মতবাদের ইতিহাসে সদা স্মরণীয়। এ বছরের শুরুতে হাকীম সাহেব এক চিঠিতে মির্যা সাহেবকে পরামর্শ দিয়েছেন, মসীহ মওউদ[৪] হওয়ার দাবী করার

২. সীরাতুল মাহদী, খ-১, পৃ-৩৯

৩. বারাহীনে আহমদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৪৯৫, ৪৯৮

৪. হাকীম সাহেব নিজের চিঠিতে যদিও শুধু 'মসীহ সদৃশ' শব্দ লিখেছেন, কিন্তু 'ফাতহে ইসলাম' ও 'আওহাম' অধ্যয়ন করলে জানা যায়, 'মাছীলে মসীহ' ও 'মসীহ মওউদ' উভয়টি সমার্থবোধক শব্দ। মির্যা সাহেব গ্রন্থগুলোতে উভয় শব্দের একটি অপরটির স্থানে ব্যবহার করেছেন। 'তাওযীহে মারাম'-এর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখেছেন– "এ অবতরণের অর্থ মসীহ বিন মারইয়াম-এর অবতরণ নয়; বরং রূপকভাবে একজন মসীহ তুল্য ব্যক্তির আসার সংবাদ দেওয়া হয়েছে, যার প্রতিপাদ্য অর্থ এলহামে এলাহী অনুযায়ী এ হতভাগাই।"

জন্য। হাকীম সাহেবের মূল চিঠি আমাদের হাতে পৌছেনি, তবে মির্যা সাহেব এ চিঠির যে জওয়াব দিয়েছেন, তাতে হাকীম সাহেবের ঐ পরামর্শের উদ্ধৃতি রয়েছে। এ চিঠি মির্যা সাহেবের পত্রাবলীতে রয়েছে। এতে ১৮৯১ সনের ২৪ জানুয়ারীর তারিখ উল্লেখ রয়েছে। এতে সংগঠনের চিন্তাগত উৎস ও এর ভিত্তি পত্তনকারীর সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে মির্যা সাহেবের এ ঐতিহাসিক চিঠির উদ্ধৃতি দেওয়া যাচ্ছে :

"যা কিছু আপনি লিখেছেন, যদি দামেশকী হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয়টি আলাদা রেখে পৃথকভাবে মসীহ সদৃশ হওয়ার দাবী উত্থাপন করা হয়, তাতে ক্ষতি কি? মূলত এ হতভাগার মসীহ তুল্য হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সে চায় আল্লাহ যেন তাকে স্বীয় অসহায় ও অনুগত বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তবে পরীক্ষায় নিপতিত হওয়া থেকে কিছুতেই পলায়ন সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষাকেই উন্নতির সোপান বানিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন:

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ -

এ পরামর্শের মূল কারণ কি ছিল? এটা কি হাকীম সাহেবের দূরদর্শিতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফসল ছিল, না তখনকার সরকারের ইংগিত? যে সরকারের হাতে অতীতে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রাহ.)-এর দীনি ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনের বিপুল ক্ষতি হয়। আর এ সময়েই মাহদী সুদানীর মাহদী হওয়ার দাবী সুদানে এক বিশ্রীরকম হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছিল। ভবিষ্যতের জন্য এ ধরনের আশংকার দুয়ার পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার জন্য এই উত্তম যে, মুসলমানের মধ্যে এমন কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব মসীহ মউউদ হওয়ার ঘোষণা করে দাঁড়িয়ে যাক, যিনি ধর্মীয় আবেগের অধিকারী হিসেবে মুসলিম সমাজের পরিচিতি লাভ করেছেন, আর যে মুসলিম জাতি বহুদিন ধরে মসীহ মওউদ-এর অপেক্ষায় আছে তারা সকলেই তার চুতস্পার্শ্বে একত্রিত হয়ে যাক? এর মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট করে কোন কিছু বলা যায় না, কার্যকারণ ও মূল নেয়ামত খুঁজে বের করা সম্ভবও নয়। তবে সংগঠনের সূচনা কিভাবে হয়েছে, এ চিঠির মাধ্যেমে কিছুটা আঁচ করা যায়।

---

৫. মকতুবাতে আহমদিয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃ-৮৫

আম্বিয়ায়ে কেরামের নবুওয়তের ঘোষণা কোন পরামর্শের মাধ্যমে হয় না

এখানে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, নবী রসূলদের ব্যাপার বাইরের পরামর্শ ও পথপ্রদর্শক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁদের উপর আসমান থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়। তাঁদের দায়িত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা এ বিশ্বাসে অটল থাকেন এবং প্রথম দিন থেকেই এর ঘোষণা দেন এবং এর উপর দৃঢ় থাকেন। তাঁদের বিশ্বাস ও দাওয়াতের ধারা কোন নির্বাচন বা পথ প্রদর্শন দ্বারা অনুগৃহীত হয় না। প্রথম দিন থেকেই তাঁরা বলেন–

وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ-وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ-

"আমাকে এর-ই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।" "আর আমি এর উপর প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী।"–(আনআম-১৬৩, আ'রাফ-১৪৩)

মসীহ অবতরণের বিশ্বাস

হযরত মসীহ (আ.)-এর অবতরণের আকীদা একটি খাঁটি ইসলামী আকীদা।[৬]

---

৬. হযরত মসীহ আলাইহিস সালামের আসমানে চলে যাওয়া এবং দ্বিতীয় বার অবতরণ করার আকীদা মুসলমানের ঐ সব মৌল আকীদাসমূহের একটি, যার কথা কোরআনে এবং অসংখ্য হাদীসে রয়েছে। মুসলমান সমাজে এ আকীদা অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে চলে আসছে। হাফেজ ইবনে কাছীর (রহ.) এর বিশ্লেষণে বলেছেন, হযরত মসীহের অবতরণের হাদীস তাওয়াতুর-এর দরজায় পৌছে গেছে। হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে আবুল হোসাইন আবরী (রহ.) থেকে তাওয়াতুর-এর কথা বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে আল্লামা শাওকানী 'আত'তাওযীহ্ ফী তাওয়াতুরে মা জা-আ ফিল মুনতাজার ওয়াদ্দাজ্জাল ওয়াল মাসীহ' নামে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। কোন আস্থাযোগ্য ব্যক্তি থেকে এর বিরুদ্ধে কোন কথা বর্ণিত হয়নি। মু'তাযেলা সম্প্রদায়ের দিকে যে কথা সম্পর্কিত, তা-ও সঠিক নয়। আল্লামা ইবনে হাযম তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'আল-ফসলু ফিল মেলাল ওয়াল নেহাল'। স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, হযরত মসীহ (আ.)-এর অবতরণের আকীদা তাওয়াতুর দ্বারা প্রমাণিত। বিস্তারিত জানার জন্য মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরীর যুগোত্তীর্ণ রচনা 'আকীদাতুল ইসলাম' দেখা যেতে পারে। যুক্তির নিরিখেও বিষয়টিকে অবান্তর বলে মনে হয় না; কারণ আল্লাহর শক্তিকে ব্যাপক এবং আল্লাহর গুণাবলী ও কর্মধারাকে পরিপূর্ণ মানার পর এমন কোন ঘটনার সম্ভাব্যতা নিয়ে সন্দেহ করা ঠিক নয়, যার বর্ণনা বিশুদ্ধ এবং অসংখ্য ধারায় প্রমাণিত। বিশেষ করে পদার্থ বিদ্যার এত উন্নতির পর এবং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের পূর্বে যে সব ঘটনাকে অবান্তর ও অসম্ভব মনে করা হতো, এসব ঘটনা বারংবার সংঘটিত হওয়ার পর। বিশেষ করে মানুষ যখন চাঁদের দেশে গিয়ে পৌছেছে এবং নিঃসীম শূন্যতায় ভ্রমণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় কোন সৃষ্টির যমীন থেকে উর্ধ্বকাশে চলে যাওয়া এবং দীর্ঘ দিন যাবত ওখানে থাকা অসম্ভব কিছু নয়। গ্রীক দর্শনের পুরনো জ্যোতির্বিদ্যার কল্পিত মূলনীতির গণ্ডিতে অবস্থান করে, যুক্তির দোহাই দিয়ে এ মাসআলায় প্রশ্ন উত্থাপন করা শিশুসুলভ প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়; এ উন্নত যুগে এর বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

মুসলিম জাতি এ আকীদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এর প্রবক্তা। হাদীস শরফে এর সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর মুসলিম জাতি উপর্যুপরি মসিবত-দুর্দশায় জর্জরিত হয়ে কোন অদৃশ্য ব্যক্তির অপেক্ষায় ছিল। বিশেষ করে হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে হযরত মসীহের আবির্ভাবের আলোচনা হচ্ছিল। হাকীম সাহেবের ধারণা হয়েছিল, মির্যা সাহেব স্বীয় দীনী খেদমত দ্বারা যে মর্তবা অর্জন করেছেন, তার ভিত্তিতে মুসলমান সমাজ মসীহের এ দাবী সানন্দে মেনে নেবে।

মির্যা সাহেবের 'মসীহ তুল্য' হওয়ার দাবী

মির্যা সাহেব যেভাবে হাকীম সাহেবের প্রস্তাব কবুল করতে অসম্মতি জানিয়েছেন এবং তাঁর চিঠিতে যে বিনয়, নম্রতা ও খোদাভীতি প্রকাশ পেয়েছে, তা শ্লাঘার বিষয়। এতে মির্যা সাহেবের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাঁর গ্রন্থমালার সমীক্ষায় তাঁর প্রতি এ শ্রদ্ধা দ্রুত বিলীন হয়ে যায়। হঠাৎ মনে হয়, মির্যা সাহেব হাকীম সাহেবের এ পরামর্শ গ্রহণ করে ফেলেছেন। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি 'মাছীলে মসীহ' বা 'মসীহের অনুরূপ সত্তা' হওয়ার দাবী উত্থাপন করেছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন।

রচনার যে ধারায় তিনি জোরালোভাবে ইসলামের পক্ষাবলম্বন এবং অপরাপর ধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন, তা ছিল মসীহ মওউদ-এর দাবী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।[৭] এর পর মির্যা সাহেবের প্রথম গ্রন্থ 'ফাতহে ইসলাম'। ছাপা হয় ১৮৯১ সনে। এটি একটি ঐতিহাসিক বছর; যে বছরটি তাঁর দুই যুগের মাঝে পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। এ গ্রন্থেই প্রথম আমরা পড়ি : তিনি 'মাছীলে মসীহ' ও 'মসীহ মওউদ'-এর দাবী করেছেন।[৮] তিনি লেখেন, "যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহর শোকর আদায় কর, এবং শুকরিয়ার সেজদা দাও, যার অপেক্ষায় প্রহর গুনতে গুনতে তোমাদের পিতৃপুরুষ গত হয়েছেন, আর অনেক রূহ তার আগ্রহে সফর করে গেছে, সে সময় তোমরা পেয়ে গেছ। এখন তার কদর করা না করা, তার থেকে উপকৃত হওয়া না হওয়া তোমাদের হাতে।

৭. এ ধারায় তাঁর তিনটি গ্রন্থ রয়েছে : এক. 'বারাহীনে আহমদিয়া, দুই. 'সুরমায়ে চশমে আরিয়া, তিন. ' শোহনায়ে হক'।

৮. মির্যা বশীর আহমদ সাহেব 'সীরাতুল মাহদী'তে লিখেছেন : "হযরত মসীহ মওউদ ১৮৯০ সনের শেষাশেষি 'ফাতহে ইসলাম' রচনা করেছেন। ১৮৯১-এর শুরুর দিকে লুধিয়ানা থেকে তা প্রকাশ করা হয়। এটিই প্রথম পুস্তিকা, যাতে তিনি 'মাছীলে মসীহ' মসীহে নাসেরী'র মৃত্যুর উল্লেখ করেছেন। সুতরাং মসীহ মওউদ এবং দাবীর এই তাঁর প্রথম ঘোষণা।" (পৃ-২৬৭-২৬৮, ১ম খণ্ড) এতে এ কথাও প্রমাণিত হয়, তিনিও মাছীলে মসীহ ও মসীহ মওউদকে প্রতিশব্দ বলে মনে করেন।

আমি বার বার তা বর্ণনা করব এবং একথা প্রকাশ করা থেকে আমি বিরত থাকব না, আমি সে ব্যক্তি যাকে সময়ের দাবী অনুযায়ী মানুষের সংশোধনের জন্য পাঠানো হয়েছে, যেন দীনকে তাজা করে মানুষের অন্তরে বসিয়ে দেওয়া যায়। আমি সে রূপেই প্রেরিত হয়েছি, যেমনিভাবে কালীমুল্লাহর পরে সেই মর্দে খোদাকে পাঠানো হয়েছিল, যার রূহ হেরোডোটাস-এর শাসনামলে বহু দুঃখ কষ্টের পর আসমানের দিকে উঠানো হয়েছে। সুতরাং যখন দ্বিতীয় কালীমুল্লাহ– যিনি মূলত সবার আগের এবং সাইয়েদুল আম্বিয়া– অন্য সব ফেরআউনকে ধ্বংস করার জন্য এসেছেন, যার ব্যাপারে বলা হয়েছে–

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلاً

অতএব যিনি কর্মের দিক থেকে প্রথম কালীমের অনুরূপ, অথচ মর্তবায় তার চেয়ে বড়, তাকেও একজন মাছীলুল মসীহের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। আর সে মসীহ ইবনে মারইয়ামের শক্তি, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য পেয়ে মসীহ ইবনে মারইয়াম কালীমে আউয়ালের সময় থেকে যতদিন পরে এসেছিলেন, ঠিক ততদিন পরে অর্থাৎ, চতুর্দশ শতাব্দীতে আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর এ অবতরণ ছিল রূহানী। যেমন পরিপূর্ণ মানুষের উঠার পরে– মানুষের সংশোধনের জন্য অবতরণ হয়ে থাকে। আর মসীহ ইবনে মারইয়াম যে সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সব দিক থেকে ঠিক সে ধরনের সময়ে অবতরণ করেছেন, যেন বোধসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন হয়।"[৯]

উদ্ধৃত বাক্যগুলোতে যথেষ্ট গোঁজামিল থাকা সত্ত্বেও (সম্ভবত তা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে) স্পষ্টভাবে মির্যা সাহেবের আকীদা এবং নতুন দাবী প্রকাশ পায়। আর এ-ও বোঝা যায়, তিনিই মাছীলে মসীহ। ১৮৯১ সনে তাঁর প্রণীত তিনটি গ্রন্থ 'ফাতহে ইসলাম' 'তাওযীহে মারাম' ও 'ইযালায়ে আওহাম' উল্লিখিত বিষয় নিয়েই রচিত। এগুলোতে বার বার এ কথারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। 'ফাতহে ইসলাম'র অপর স্থানে তিনি লেখেন :

এ অভাগার অনেক বুযুর্গের সাথে স্বভাবগত মিল থাকা ছাড়াও– যার বিস্তারিত বিবরণ 'বারাহীনে আহমদিয়া'য় রয়েছে, হযরত মসীহের স্বভাবের সাথে বিশেষভাবে সামঞ্জস্য রয়েছে, যেন ক্রুশীয় বিশ্বাস খানখান করে দেওয়া

৯. ফাতহে ইসলাম, পৃ-৬ ৭

যায়। সুতরাং আমি ক্রুশ ভাঙ্গার এবং শুয়োর হত্যা করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। আমি আসমান থেকে সে সকল পবিত্র ফেরেশতার সাথে অবতীর্ণ হয়েছি আমার ডানে বামে যারা রয়েছেন।"[১০]

'ফাতহে ইসলামে'র পর তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'তাওযীহে মারাম'। গ্রন্থখানি আরম্ভ করেছেন এ ধরনের সুস্পষ্ট বাক্য দিয়ে, 'মুসলমান ও ঈসায়ীদের সামান্য কিছু পার্থক্যের সাথে এ ধারণা, হযরত মসীহ ইবনে মারইয়ামকে এ দুনিয়ার অস্তিত্ব থেকে আসমানের দিকে উঠানো হয়েছে এবং কোনো এক সময়ে তিনি আসমান থেকে অবতরণ করবেন, এ ধারণা যে ভুল তা আমি এ পুস্তিকায় লেখেছি। এ-ও বর্ণনা করেছি, এ অবতরণ দ্বারা মূলত হযরত মসীহ ইবনে মারইয়ামের অবতরণ উদ্দেশ্য নয়; বরং রূপকভাবে একজন মসীহ তুল্য ব্যক্তির আগমনের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। স্বর্গীয় বাণী অনুযায়ী যার প্রতিপাদ্য এ নগণ্যই।"[১১]

সমস্যা ও সমাধান

যেহেতু হাদীসের বর্ণনাসমূহের উপর হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল, তাই এ দাবী উঠানোর পর যে সব ইলমী সমস্যা একের পর এক সামনে আসে, সে সব ব্যাপারেও তিনি সজাগ ছিলেন।

যে সব সেফত হযরত মসীহ (আ.)-এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, ঐ সব সেফত মির্যা সাহেব কিভাবে নিজের উপর খাপ খাওয়াাবেন, তার জন্য পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল। এখানে এ ধরনের সমস্যা ও তার কতিপয় উদ্ভট সমাধানেরও কিছু নমুনা পেশ করা হলো।

দামেশ্‌ক-এর ব্যাখ্যা

নুযূলে মসীহের রেওয়ায়েতগুলোর মধ্যে যেগুলোর উপর ভিত্তি করে মির্যা সাহেব মসীহ মওউদ-এর দাবী দাঁড় করিয়েছেন তাতে হযরত মসীহের অবতরণের ধরন ও বিভিন্ন তাফসীলী আলোচনা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো, হযরত মসীহের অবতরণ দামেশকে হবে। এখন যদি মির্যা সাহেব মসীহ

---

১০. ফাতহে ইসলাম, টীকা, পৃ-৯

১১. তাওযীহে মারাম, পৃ-২

মওউদ হয়ে থাকেন, তবে এ সংবাদ সহীহ হয় কিভাবে? দামেশক ও কাদিয়ানের দূরত্ব তো অনেক। উভয় স্থানের ভৌগোলিক পার্থক্য তো একজন প্রাথমিক ছাত্রের বরং একজন সাধারণ মানুষেরও জানা। হয়তো মির্যা সাহেব এ প্রশ্নের কথা কখনো ভেবে দেখেননি। হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (যিনি হাদীসের একজন ভাল ছাত্র ছিলেন) মির্যা সাহেবের দৃষ্টি এদিকে ফেরান। এখন উত্তম হলো, আমরা খোদ মির্যা সাহেবের মুখ থেকে শুনব, এ দিকে তাঁর দৃষ্টি কিভাবে গেল আর তিনি এর কি সমাধান বের করলেন। ইযালাতুল আওহামের এক টীকায় তিনি লেখেন :

"এ অভাগা এখানো এ কথার (দামেশকের রহস্য) সন্ধানের দিকে মুখ ফেরায়নি যে, এর অর্থ কি, এরই মধ্যে আমার নির্ভরযোগ্য বন্ধু মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন কাদিয়ানে তশরীফ আনেন। তিনি দরখাস্ত করেন, মুসলিম শরীফের হাদীসে 'দামেশক'সহ যে সব অস্পষ্ট শব্দ রয়েছে, এগুলোর অর্থে স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে যেন তাওয়াজ্জুহ করা হয়। যেহেতু এ দিনগুলোতে আমি অসুস্থ ছিলাম এবং মস্তিষ্ক পরিশ্রমের উপযোগী ছিল না, এজন্য তখন আমি এ উদ্দেশ্যগুলোর দিকে মনোযোগ দিতে পারিনি। সামান্য তাওয়াজ্জুহ দেওয়ার দ্বারা শুধু একটি শব্দ 'দামেশক' এর রহস্য আমার সামনে খুলে যায়।"[১২]

এরপর তিনি 'দামেশক'-এর ব্যাপারে তার ব্যাখ্যা এভাবে পেশ করেছেন–

"স্মরণযোগ্য যে, দামেশক শব্দের ব্যাখ্যায় আমার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কথা প্রকাশ করা হয়েছে, এমন এক ছোট শহরের নাম দামেশক রাখা হয়েছে, যেখানে সব মানুষ বাস করে, যারা ইয়াযিদী প্রকৃতির এবং নাপাক ইয়াযিদের স্বভাব ও চিন্তাধারার অনুসরণ করে। তাদের অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন মহব্বত এবং আহকামে এলাহীর প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। তারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে নিজেদের চরিত্র বানিয়ে রেখেছে। আর তারা নিজেদের নফসে আম্মারার এত অনুগত, পবিত্রাত্মাদের খুন করা তাদের দৃষ্টিতে একেবারে সহজ। তারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না এবং খোদা তায়ালার অস্তিত্ব তাদের দৃষ্টিতে একটি জটিল বিষয়, যা তাদের বুঝে আসে না। আর ডাক্তারদের যেহেতু রোগীদের কাছে যেতে হয়, তাই অবশ্যম্ভাবী হচ্ছে, মসীহ এ

---

১২. ইযালায়ে আওহাম, পৃ-৩২, ৩৩

ধরনের লোকদের প্রতিই অবতণ করবেন।[১৩] সুতরাং মসীহের দামেশকে অবতরণ করা স্পষ্টত এ কথা বোঝায়, মসীহ তুল্য কোন ব্যক্তি, হোসাইনের সাথেও যার সাদৃশ্য রয়েছে, ইয়াযিদদের সতর্ক ও শায়েস্তা করার জন্য অবতরণ করবেন যারা ইহুদীদের ন্যায়।[১৪] দামেশক শব্দটি রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।"[১৫]

তখন সে আমাকে বলল, এরা ইয়াযিদী স্বভাবের এবং এ গ্রাম (কাদিয়ান) দামেশক-এর অনুরূপ। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা একটি বড় কাজের জন্য এ অভাগাকে দামেশকে অবতীর্ণ করেছেন।

بطرف شرقى عند المنارة البيضاء من المسجد الذى من دخله كان امنا وتبارك الذى انزلنى فى هذا المقام۔ ٢١

দুটো হলুদ চাদর

নুযূলে মসীহের সময়কার অবস্থা এবং ঘটনার যে বিবরণ হাদীস শরীফে এসেছে, এগুলোকে মির্যা সাহেব নিজের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সূক্ষ্ম বিবৃতি বানাতে শুরু করে দিলেন। মনে হয়, তিনি স্বীয় পাঠক ও শ্রোতাদের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন, তারা দূর থেকে দূরতম কোন ব্যাখ্যা বা বোধের অগম্য কোন বিশ্লেষণও কবুল করে নেবে। মির্যা সাহেবের বিরোধীরা তাঁর উপর প্রশ্ন উঠিয়েছেন, নুযূলে মসীহের যে সব হাদীস দ্বারা তিনি প্রমাণ পেশ করেন এবং যেগুলোর উপর নিজের দাওয়াত ও দাবীর ভিত্তি দাঁড় করান, এগুলোতে এ কথাও আছে, হযরত মসীহ যখন অবতীর্ণ হবেন তখন তাঁর দুটো হলুদ চাদর থাকবে। এর জওয়াবে মির্যা সাহেব বলেন :

'আমি এক চিররোগী মানুষ। ঐ দুই হলুদ চাদর, যার ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে, মসীহ দুটো হলুদ চাদর পরে অবতরণ করবেন, এ চাদর দুটো আমার অবস্থার সাথে মিলে গেছে।– স্বপ্ন ব্যাখ্যাতাদের দৃষ্টিতে যার ব্যাখ্যা দুটো

---

১৩. ইযালায়ে আওহামের টীকা, পৃ-৩৩, ৩৪
১৪. ইযালায়ে আওহামে, পৃ-৩৪
১৫. প্রাগুক্ত
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৬৮

রোগবিশেষ। একটি চাদর আমার উপরের অংশে, অর্থাৎ সব সময় মাথা ব্যথা, মাথা ঘূর্ণন, অনিদ্রা ও খিচুনির রোগ থাকে। আর দ্বিতীয় রোগ যা আমার শরীরের নিম্নভাগে রয়েছে তা হলো, অনেক দিন ধরে আমার ডায়াবেটিস। সময় সময় রাত বা দিনে শত শত বার পেশাব করতে হয়। এত অধিক বার পেশাব হওয়ার কারণে শরীরে যে পরিমাণ দুর্বলতা আসে তার সবই আমার আছে।'[১৭]

দামেশকের মিনারা

হাদীস শরীফে দামেশকের পূর্ব মিনারার উল্লেখ রয়েছে, যার উপর হযরত মসীহ অবতরণ করবেন। মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব দামেশক শব্দের ন্যায় এর বিশ্লেষণে কষ্ট স্বীকার করার পরিবর্তে কাদিয়ানের পূর্ব এলাকায় একটি মিনারা নির্মাণ করা অধিক ভাল মনে করেছেন। সীরাতুল মাহদী পাঠে জানা যায়, তিনি ১৯০০ সনে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি এর জন্য চাঁদার লিষ্ট তৈরি করেন এবং মানুষকে চাঁদাদানে উৎসাহিত করেন।[১৮]

১৯০৩ সনে তিনি এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন,[১৯] কিন্তু এ মিনারার কাজ তাঁর জীবদ্দশায় সমাপ্ত হয়নি। এ সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাঁর পুত্র মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ।

বিদ্রূপ ও উপহাস

এ তিনটি রচনায় মির্যা সাহেবের মনের ক্ষোভ অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর লেখায় এত পরিমাণ বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার তিক্ততা এসে গিয়েছিল যে, এর কারণে এই কিতাবগুলো গাম্ভীর্যপূর্ণ গ্রন্থ এবং দাওয়াতী ও সংশোধনমূলক রচনা হওয়ার পরিবর্তে নিন্দাবাদ ও উপহাসের কিতাবে পরিণত হয়ে গেছে। এ কিতাবগুলোতে মির্যা সাহেব লেখার যে ধরন গ্রহণ করেছেন তা পয়গম্বরদের না হয় বাদ-ই দেওয়া গেল, মোজাদ্দেদ বা সংস্কারকদের ছেড়ে দিয়ে নিরপেক্ষ এবং গাম্ভীর্যের অধিকারী লেখকদের সাথেও কোন সামঞ্জস্য রাখে না। মসীহের

---

১৭. আরবাঈনের পরিশিষ্ট, সংখ্যা-৩,৪, পৃষ্ঠা-৪

১৮. মিনারাতুল মসীহ-এর চাঁদার বিজ্ঞাপন, খুতবায়ে এলহামিয়া গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, পৃ-১

১৯. সীরাতুল মাহদী, খণ্ড-২, পৃ-১৫৪

জীবন ও অবতারণের আকীদায় যারা বিশ্বাসী তাদের নিয়ে তিনি এমনভাবে তামাশা করেছেন যে, তা একটা ইলমী মাহফিলের পরিবর্তে আমীর ওমরাদের হাস্য কৌতুকের দরবারের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে গেছে। এ ছাড়া তাঁর মাঝে ঝগড়া করার যে মানসিকতা রয়েছে, নবীদের কথা বা স্বভাবের সাথে তার কিছুমাত্র দূরবর্তী মিলও নেই।

আসমানে হযরত মসীহের আজ পর্যন্ত জীবিত থাকা যুক্তির দিক থেকে অবান্তর প্রমাণিত করে, তার উপর যৌক্তিকতার প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি লেখেছেন : 'ঐগুলোর মধ্য থেকে একটি প্রশ্ন এও যে, যদি আমরা অবাস্তবকে কতক্ষণের জন্য মেনে নেওয়ার মত, হযরত মসীহ মাটির শরীরে আসমানে পৌছে গেছেন মনে করি, তবে অবশ্যই একথা মানতে হয়, সময়ের প্রতিক্রিয়া তিনি আসমানেও গ্রহণ করেন- যা প্রাণীজগতের প্রত্যেকটির অস্তিত্বের জন্য অতীব জরুরি, আর সময়ের অতিক্রমে অবশ্যই একদিন তাঁর মৃত্যু হওয়ার কথা। সুতরাং এ অবস্থায় হযরত মসীহের ব্যাপারে এটা মানতে হয়, তিনি আয়ুর মেয়াদ পূর্ণ করে আসমানেই মৃত্যুবরণ করেছেন।[২০] আর গ্রহ উপগ্রহের জগত, যা আজকাল স্বীকৃত সত্য, এ গুলোর কোন একটির কবরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। আর যদি আপাতত ধরে নেই, তিনি এখানো জীবিত আছেন, তাহলে নিঃসন্দেহে এত দিন চলে যাওয়ার পর অবশ্যই তিনি জরাগ্রস্ত বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গেছেন। সুতরাং এখন তিনি কোন দীনী খেদমত করার

---

২০. মির্যা সাহেবের সময়ে পদার্থ বিদ্যার এত উন্নতি সাধিত হয়নি। অন্যান্য গ্রহ বা মহাশূন্য সম্পর্কে এরকম নতুন নতুন আবিষ্কার তখনও হয়নি। তা হলে তিনি জানতে পারতেন, পৃথিবীর সময় ও স্থান। (Time & Space)-এর নিয়ম কানুন অপরাপর গ্রহ ও মহাশূন্যে প্রয়োগ হয় না। এখানকার সময়ের ধারণা ও পরিমাপ ওখানকার সময়ের পরিমাপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানকার এক হাজার বছর ওখানকার এক মুহূর্তের সমান হতে পারে। সুতরাং লয় ও পরিবর্তন, অনুভব ও প্রয়োজনের দিক থেকে উভয় জগতে বহু পার্থক্য। মানুষের পুরনো দুর্বলতা হচ্ছে, মানুষ নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং নিজের যুগের বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতিগুলোর উপর প্রয়োজনের বেশি আস্থা রাখে। এর ফলে বিনা দ্বিধায় এমন সব সত্য অস্বীকার করে বসে, যা তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় আসেনি।

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ (يونس ٣٩)

পরন্তু ওরা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করেনি তা অস্বীকার করে এবং এখনও এর পরিণাম ওদের নিকট উপস্থিত হয়নি। -(ইউনুস : ৩৯)

মত সামর্থ অবশ্যই রাখেন না। এমতাবস্থায় তাঁর দুনিয়ায় তাশরীফ আনা অনর্থক কষ্ট করা ছাড়া আর কোন ফায়দা হবে বলে মনে হয় না।[২১]

এক স্থানে তিনি وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ-এর প্রচলিত অর্থের প্রতি বিদ্রূপ করে লিখেছেন : "হযরত মসীহের দুনিয়ায় আগমন করার পর উত্তম কাজ কি এটাই হবে যে, তিনি শুয়োর শিকারের খেলা করে ফিরবেন আর অনেক কুকুর তাঁর সাথে থাকবে? যদি এ-ই সত্য হয়, তবে তো শিখ, চামার, বাদিয়া, ডোম, সাপুড়ে ইত্যাদি যারা শুয়োর শিকার করা খুবই পছন্দ করে, তাদের জন্য বড়ই সুসংবাদের বিষয় হবে; কারণ তাদের তা ভালই হবে।"[২২]

নুযূলে মসীহের রহস্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে অপর এক জায়গায় লিখেছেন : "এরূপ যেন না হয় যে, বেলুনে চড়ে তোমাদের সামনে অবতরণকারী কারুর ব্যাপারে ধোকায় পড়ে যাও। সুতরাং সাবধান! নিজেদের এ বদ্ধমূল ধারণার কারণে এ ধরনের কাউকে ইবনে মারইয়াম মনে করে বসো না যেন।"[২৩]

নুযূলে মসীহের আকীদার আলোচনা করতে গিয়ে অপর এক স্থানে লিখেছেন : "ভাইয়েরা আমার, এ আলোচনার দুটো ঠ্যাং ছিল।

(১) একটি তো ইবনে মারইয়ামের শেষ যমানায় মাটির দেহে আসমান থেকে অবতরণ করা। কুরআন শরীফ ও অনেক হাদীস ইবনে মারইয়ামের মৃত্যুর কথা বর্ণনা করে এ ঠ্যাং তো ভেঙ্গে দিয়েছে।

(২) নির্দিষ্ট দাজ্জালের শেষ যমানায় প্রকাশ পাওয়া– এ ঠ্যাং সহীহ মুসলিম ও সহীহ বুখারীর হাদীসসমূহ, যা অনেক বড় বড় সাহাবার বর্ণনায় এসেছে, দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। আর ইবনে সাইয়াদকে নির্দিষ্ট দাজ্জাল বানিয়ে মুসলমানের জামাতে ঢুকিয়ে হত্যা, করে দিয়েছে। এখন যখন এ আলোচনার দুটি পা-ই ভেঙ্গে গেছে; সুতরাং আজ তেরশ' বছর পরে এ লাশ, যার উভয় পা-ই ভাঙ্গা, কিভাবে এবং কাকে আশ্রয় করে দাঁড়াবে?"[২৪]

অপর এক জায়গায় এ ধরনের কৌতুক করেই লিখেছেন : "এ হাদীসের উপর কি ঐক্যমত প্রমাণিত হতে পারে যে, মসীহ এসে বনে জংগলে শুয়োর শিকার করে ফিরবেন আর দাজ্জাল কাবা ঘরের তওয়াফ করবে এবং ইবনে

২১. ইযালায়ে আওহাম, পৃ-২৫, ২৬
২২. প্রাগুক্ত, পৃ-২১.
২৩. ইযালায়ে আওহাম, পৃ-১৪৩
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৩, ১৩৪

মারইয়াম রোগীদের ন্যায় দুজন মানুষের কাঁধে হাত রেখে কা'বা ঘরের তওয়াফের ফরয আদায় করবেন? একথা কি জানা নেই যে, এসব হাদীসের অতীত দিনের ভাষ্যকারগণ কিভাবে অনির্দেশের পানে নিজেদের পাল্লা হাঁকাচ্ছে।"[২৫]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কেরামকে উদ্দেশ করে অপর এক জায়গায় বলেছেন : "হে মৌলবী সাহেবরা, কুরআন শরীফের প্রচলিত অর্থ অনুসারে যেহেতু মসীহের মৃত্যু প্রমাণিত হয়, আর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অনেক সাহাবা ও মোফাসসের এ কথা মেনে আসছেন, তাহলে আপনারা অন্যায়ের পক্ষে কেন জেদ ধরেছেন? ঈসায়ীদের খোদাকে মরতে তো দেবেন! কতদিন পর্যন্ত তাকে 'হাইয়্যুল লা ইয়ামূতু' বলতে থাকবেন? এর একটা শেষও তো আছে।!"[২৬]

সমকালীন যুগের পদার্থবিদ্যার গবেষণা দ্বারা প্রভাবিত

মির্যা সাহেবের এ সময়কার রচনাবলী থেকে জানা যায়, হিন্দুস্তানে সে কালে পদার্থ বিজ্ঞানের যে গবেষণা হচ্ছিল, তিনি তার মূলনীতি দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন। অথচ ইউরোপে তখন পদার্থ বিদ্যার ছিল শৈশব। আর মির্যা সাহেবের পড়াশোনা ছিল আরো ভাসা ভাসা এবং Second hand। মসীহ অবতরণের আকীদা অস্বীকার করার মূল কারণ সম্ভবত এ-ই যে, এ বিশ্বাস বিজ্ঞানের আধুনিক মূলনীতির সাথে খাপ খায় না। আর আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য এ হবে হাস্যকর ব্যাপার। ইযালায়ে আওহামের এক স্থানে লিখেছেন : এ বিজ্ঞানের যুগে, যে যুগ উন্নত জ্ঞান ও উন্নত মান সাথে নিয়ে চলে, এ ধরনের বিশ্বাস নিয়ে দীনি কামিয়াবীর আশা পোষণ করা বড় রকমের নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়।[২৭] যদি আফ্রিকার বালুময় প্রান্তর বা আরবের বেদুঈন বা গ্রাম্যদের মাঝে বা দ্বীপবাসী ও জংলী মানুষের কাছে এরকম অযৌক্তিক কথা প্রচার করা যায়, তবে সম্ভবত তা সহজে প্রচারিত হয়ে যাবে,

---

২৫. ইযালায়ে আওহাম, পৃ-২১৪

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ-২৩৫

২৭. জানা নেই, মির্যা সাহেব অন্যান্য অদৃশ্য বিষয়াবলী : ওহী, ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির বিশ্বাস ও প্রচার কিভাবে করলেন। আর যে ঈমান বিল গায়েব দীনের রূপ ও হেদায়েতের বুনিয়াদ, তাকে কিভাবে মেনে নিলেন। উপরের উদ্ধৃতি থেকে ঐ পরাজয়ী মনোবৃত্তি ও আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি অন্ধ মোহের পরিচয় পাওয়া যায়, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অর্ধ শিক্ষিত লেখকদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আমরা এরকম শিক্ষা যা সব দিক থেকে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানের বিপরীত আর যা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হতে পরে না, বরং এর বিপরীত হাদীস পাওয়া যায় শিক্ষিত সমাজের সামনে কখনো প্রচার করতে পারি না, আর ইউরোপ ও আমেরিকার বোধসম্পন্ন লোক- যারা স্বধর্মের বাজে জিনিসগুলো থেকে হাত গুটিয়ে রাখছে, তাদের কাছে হাদিয়া স্বরূপ পাঠাতে পারি না। আধুনিক বিজ্ঞানের আলো যাদের মনোজগতে মানবিক শক্তির প্রসার ঘটিয়েছে, তারা এ ধরনের কথা কিভাবে মেনে নিতে পারে, যা আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট অবমাননা ও আল্লাহর কিতাবের মূলনীতি খণ্ডন করে।"[২৮]

এ ধরনের সমালোচনা পড়ে মনে হয়, লেখক 'সুরমায়ে চশমে আরিয়া'র রচয়িতা নন, যিনি মোজেযার সম্ভাব্যতা ও সংঘটন নিয়ে জোরদার আলোচনা করে ছিলেন। সেখানে তিনি বলিষ্ঠভাবে বলেছিলেন, মানুষের সীমিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলো কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

অক্ষরের মান অনুপাতে আঙ্কিক প্রমাণ পেশ

এ গ্রন্থে মির্যা সাহেব অক্ষরের মান অনুপাতে আঙ্কিক হিসাবেও প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এখানে এসে বাতেনী সম্প্রদায়ের লেখকদের সাথে তাঁর মিল পাওয়া যায়– যারা বাক্যের হরফের মান যোগ করে দীনের বড় বড় আকীদা ছাবেত করত। মির্যা সাহেব লেখেন : 'আমাকে স্বর্গীয় ইংগিতের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত নামের হরফের সংখ্যার দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, দেখো! এ-ই সে মসীহ, ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ণ হবার পর যার আগমনের কথা ছিল। প্রথমেই এ তারিখ আমি নামের মাঝে নির্ধারিত করে রেখেছি। আর সে নাম হলো, "মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী"। এ নামের সংখ্যা তেরশ'। এ কাদিয়ান অঞ্চলে হতভাগা ছাড়া আর কারুর নাম গোলাম আহমদ নেই; বরং আমার অন্তরে এ কথা ঢালা হয়েছে, এ হতভাগা ছাড়া বর্তমান দুনিয়ায় আর কারুর নাম গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নেই। এ অভাগার সাথে আকছার আল্লাহর সুন্নত এরকম জারি রয়েছে যে, তিনি হরফের সংখ্যার রহস্য আমার সামনে উন্মোচিত করে দেন।'[২৯]

---

২৮. ইযালায়ে আওহাম, পৃ.-১৩৫

২৯. ইযালায়ে আওহাম, পৃ-৯০

আপর এক জায়গায় লিখেছেন :

"এখন এ তাহকীক দ্বারা প্রতীয়মান হয়, কুরআন শরীফে শেষ যমানায় মসীহ ইবনে মারইয়ামের আসার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। মসীহের আবির্ভাবের যে চৌদ্দশ' বছর কুরআন শরীফে নির্ধারণ করা হয়েছে, অনেক আওলিয়ায়ে কেরাম নিজেদের ঐশী ইংগিতের ভিত্তিতে এ সময়কাল মেনে থাকেন। আর আয়াত– ৩০ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ হরফের সংখ্যার হিসাবে যার মান দাঁড়ায়, বারশ' চুয়াত্তর– ইসলামী চাঁদের সর্বশেষের রাত্রিগুলোর দিকে ইংগিত বহন করে, যার মাঝে নতুন চাঁদ আবির্ভাবের ইশারা লুকায়িত রয়েছে। হরফের সংখ্যার মান অনুপাতে যে সংখ্যা পাওয়া যায় মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মধ্যে।"[৩১]

এসব কিতাবে মির্যা সাহেব হাদীসের শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, এগুলোর প্রতিপাদ্য অর্থ নির্গত করার ব্যাপারে এত উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন, যা কোন লেখক বা কবির পক্ষে নিজের কথার ব্যাখ্যায়ও সম্ভব নয়। তিনি ঐ শব্দগুলোকে রূপক, দ্ব্যর্থবোধক ও রহস্যাবৃত বলে চালিয়ে দিয়েছেন। আর পূর্ববর্তী সেই বাতেনীদের কথা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যারা দীনী পরিভাষা ও শরয়ী শব্দগুলোর (যার শব্দ ও অর্থ উভয়ই নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় চলে আসছে) এমন দূরবর্তী ও হাস্যকর অর্থ বর্ণনা করত, যার না ছিল কোন পারিভাষিক ভিত্তি, না ছিল যুক্তির ভিত্তি। এভাবে ওরা জাতির মাঝে ধর্মদ্রোহিতা ও বিশৃঙ্খলার দরজা খুলে দিয়েছিল। মির্যা সাহেব 'ইযালায়ে আওহাম' গ্রন্থে বার বার সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, হুযূর (সা.)-এর কাছে ইবনে মারইয়াম ও দাজ্জালের রহস্য পুরোপুরি স্পষ্ট ছিল না। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এর সংক্ষিপ্ত জ্ঞান দিয়েছেন মাত্র।[৩২]

---

৩০. স্মর্তব্য যে, সূরা মু'মিনুন-এর আয়াত বৃষ্টি সম্পর্কিত। পূর্ণ আয়াত এরকম :

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً م بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ م بِهِ لَقَادِرُونَ (المومنون-١٨)

এবং আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে; অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি; আমি তা অপসারিত করতেও সক্ষম।'–(মু'মিনুন : ১৮)

৩১. ইযালায়ে আওহাম, খ-২ , পৃ-৩৩৮

৩২. প্রাগুক্ত, ৩৪৬

হযরত মসীহ্ কাশ্মীরে

মির্যা সাহেব ওফাতে মসীহের ব্যাপারে বরাবর চিন্তা ফিকির করছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর তাহকীক এই হয়েছিল, মসীহের ইন্তেকাল হয়েছে কাশ্মীরে এবং এখানেই তাঁর দাফন হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি নিজের স্বভাবসুলভ নিতান্ত সূক্ষ্ম কথা উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, কাশ্মীরী ভাষায় কাশ্মীরের উচ্চারণ কাশীর হয়। আর অনুসন্ধানে জানা গেছে, এ শব্দটি মূলত ইবরানী ভাষার। এ শব্দটি দুটো বস্তুত সন্ধিতে গঠিত হয়েছে : এক. 'কাফ', দ্বিতীয়. 'আশীর'। 'কাফ' উপমা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়, আর ইবরানী ভাষায় 'আশীর' অর্থ শাম বা সিরিয়া অর্থাৎ সিরিয়ার ন্যায়। হযরত ঈসা (আ.) যখন ফিলিস্তিন থেকে হিন্দুস্তানের এ অঞ্চলের দিকে হিজরত করলেন, যা সুন্দর আবহাওয়া, মাতানো মওসুম ও সবুজ শ্যামলমিলায় সিরিয়ার অনুরূপ ছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর মন সন্তুষ্ট করার জন্য এ জায়গার নাম রেখে দিলেন كاشير। আলিফ পড়ে গেছে, বেশী ব্যবহার হওয়ার কারণে। এরপর কাশীর হয়ে গেছে।

এরপর তিনি দেখিয়েছেন, শ্রীনগরের খান ইয়ার মহল্লায় 'বূযাছিফ'-এর কবর নামে যে বিখ্যাত কবর রয়েছে, এটা হযরত মসীহেরই কবর। যাকে শাহযাদা উপাধিতে স্মরণ করা হয়। তিনি নিজের এ নতুন গবেষণা প্রমাণিত করার জন্য এবং বূযাছিফ ও তার কবরকে হযরত মসীহের কবর বানানোর জন্য এমন সব কাল্পনিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন, যা ইলমী কোন তাহকীকের পরিবর্তে গল্পকারদের গাঁজাখোরী গল্প বলে মনে হয়। আর ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদেরা যারা সর্ষে দানাকে পাহাড় বানাবার বিশেষ যোগ্যতা রাখেন, মির্যা সাহেবের সামনে তাদেরও ছোট বলে মনে হয়।[৩৩]

এ স্থলে পৌঁছে মির্যা সাহেবের আধ্যাত্মিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দাবী দাওয়ার একটি মনযিল অতিক্রম হয়। এ মনযিলে পৌঁছে তিনি মসীহ মওউদ হওয়ার দাবী করেন এবং একে আকলী-নকলী দলিল দিয়ে প্রমাণ করেন।

---

৩৩. বারাহীনে আহমদিয়া, পৃ-২২৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মসীহ্ মওউদের দাবী থেকে নবুওয়ত পর্যন্ত

একটি গোছালো চিত্র

মির্যা সাহেবের রচনাবলী নিরপেক্ষ ও অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে অধ্যয়ন করলে পাঠকের এ ধারণা জন্মায়, মির্যা সাহেবের ঘোষণা ও দাবী দাওয়ার ক্রমোন্নতি একটি সুকৌশল প্রোগ্রামের মাধ্যমে হয়েছে। তিনি ঘোষণা প্রদান ও এ পথ অতিক্রম করার ব্যাপারে অত্যন্ত ধৈর্য এবং সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি বাতেনী এলহামকে রসূল (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণের অত্যাবশ্যকীয় ফল বলে বর্ণনা করেছেন। যা অর্জিত হয়ে থাকে রসূলের মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি লীন করে দিতে পারলে। তিনি নবুওয়ত ও নবী শব্দটি স্পষ্টভাবে মুখে উচ্চারণ না করে নবীদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী নিয়ে কথা বলেন। আর প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, নবীদের গুণ রাজি উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যম হিসেবে অর্জিত হয়ে থাকে। এ কথা ও এ ভূমিকার সাধারণ পরিণতি এই হওয়া স্বাভাবিক, একদিন মির্যা সাহেব নবুওয়তের দাবী করবেন এবং নিজের মুখেই তা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করবেন। মনে হয়, তিনি এর জন্য উপযুক্ত স্থান ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি এ কথার উপর আস্থাশীল হতে চান, তাঁর প্রতি মানুষের ভক্তি কি এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, মানুষ তাঁর অন্যান্য দাবী দাওয়ার ন্যায় এ দাবীও সানন্দে মেনে নেবে?

সুস্পষ্ট ঘোষণা

শেষতক ঘটনা সামনে এসে গেল। ঈসায়ী ১৯০০ সনের কথা। জুমার সালাতের খতীব মৌলবী আবদুল করীম সাহেব একটি জুমার খুতবা পড়লেন। তাতে মির্যা সাহেবের জন্য তিনি 'নবী' এবং 'রসূল' শব্দ ব্যবহার করেন। এ খুতবা শুনে মৌলবী সাইয়েদ মুহম্মদ আহসান আমরূহী চিন্তায় পড়ে যায়। মৌলবী আবদুল করীম সাহেব এ কথা জানতে পেরে অপর একটি খুতবা

পড়লেন। যাতে মির্যা সাহেবকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন : যদি আমি ভুল করে থাকি, হুযুর আমাকে শুধরে দিন। আমি আপনাকে নবী ও রসূল বলে মানি। জুমার সালাত শেষে মির্যা সাহেব যখন যেতে লাগলেন, মৌলবী সাহেব পেছন দিক থেকে মির্যা সাহেবের কাপড় টেনে ধরলেন এবং নিবেদন করলেন : যদি আমার এ বিশ্বাসে কোন ভুল থাকে তবে আপনি ঠিক করে দিন। তখন মির্যা সাহেব ঘুরে দাঁড়ালেন এবং বললেন : মৌলবী সাহেব, আপনি যা বর্ণনা করেছেন, আমারও বিশ্বাস এবং দাবী তা-ই। এ খুতবা শুনে মুহাম্মদ আহসান সাহেব রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ফিরে এলেন এবং মসজিদের উপর পায়চারি করতে লাগলেন। মৌলবী আবদুল করীম সাহেব ফিরে এলে মৌলবী মুহাম্মদ আহসান সাহেব তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে উদ্যত হন। উভয়ে যখন জোরে জোরে কথা কাটাকাটি করছিলেন, মির্যা সাহেব তখন ঘর থেকে বের হয়ে এ আয়াত আবৃত্তি করলেন :

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ-১

(الحجرات-২)

হে মু'মিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজ দিগের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না। –হুজুরাত : ২

এভাবে মৌলবী আবদুল করীম সাহেবের এ ঘোষণা থেকে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। আর মির্যা সাহেবের এ কথা জানা হয়ে গেল, তাঁর প্রতি মানুষের ভক্তি এতই জমে গেছে যে, মানুষ তাঁর সকল দাবীই বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে। মির্যা সাহেবের বড় ছেলে মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ এ রহস্যকে বড় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, মির্যা সাহেব নিজেকে ঐ সব গুণাবলী দ্বারা গুনান্বিত করতেন, যা নবী ছাড়া অন্যদের মধ্যে পাওয়াই যায় না; এতদসত্ত্বেও তিনি নবুওয়ত অস্বীকার করতেন, কিন্তু যখন তাঁর মাঝে এ বিরোধের অনুভব হল এবং তিনি অনুমান করলেন, এতদিন যাবত তিনি যে দাবী করে আসছেন তার মধ্য এবং ঐ সব গুণাবলীর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই,

---

১. সাইয়েদ সরওয়ার শাহ সাহেবের তাকরীর থেকে সংগৃহীত। সালানা জলসা, কাদিয়ান। দ্রষ্টব্য : আল ফযল পত্রিকা, কাদিয়ান, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা-৫১, তারিখ-৪ জানুয়ারী, ১৯২৩ এবং হাকীকাতুন নবুওয়ত, পৃ-১২৪

তখন তিনি নিজের নবুওয়তের খোলাখুলি ঘোষণা দিয়ে দিলেন। মির্যা মাহমুদ সাহেব লিখেছেন : "সারকথা হল, হযরত মসীহ মওউদ শুরু থেকেই মনে করতেন, তিনিই নবী যিনি নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন, অথবা কতিপয় হুকুম রহিত করে দেন অথবা সরাসরি নবী হন। একজন নবীর যাবতীয় শর্তাবলী তাঁর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও নবী নাম গ্রহণ করতে তিনি সব সময় অস্বীকার করতেন। যদিও তিনি সে সব কথার দাবী করতেন, যা পাওয়া গেলে কোন ব্যক্তি নবী হয়ে যায়।

কিন্তু যেহেতু তিনি এ শর্তগুলোকে নবীর শর্ত বলে মনে করতেন না; বরং মোহাদ্দেসের শর্ত বলে মনে করতেন, এজন্য নিজেকে তিনি মোহাদ্দেস বলতে থাকেন। তিনি জানতেন না যে, দাবীর যে ধরন আমি বর্ণনা করছি, তা তো নবীদের ছাড়া আর কারুর মাঝে পাওয়া যায় না, অথচ আমি নবী হওয়া অস্বীকার করছি, কিন্তু যখন জানতে পারলেন, শুরু থেকে তিনি যে ধরনের দাবী করে আসছেন এ ধরনের দাবী নবুওয়তের, মোহাদ্দেস হওয়ার নয়, তখন সুস্পষ্টভাবে তিনি নবী হওয়ার ঘোষণা প্রদান করলেন।"[২]

মোট কথা, মির্যা সাহেবের এতদিন যাবত স্পষ্টভাবে নবুয়তের দাবী না করার কারণ এটাই হোক যে, তাঁর নিকট নবী হওয়ার জন্য নতুন শরীয়ত নিয়ে আসা, পেছনের কোন বিধান রহিত করা এবং কোন মাধ্যম ছাড়া নবী হওয়া জরুরি ছিল, আর শেষ পর্যন্ত তাঁর এ ভুল ধারণা দূর হয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে এ ঘোষণা প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, অথবা দেরী করার কারণ এটা হোক যে, তাঁর নিকট তখনো এর সময় হয়ে সারেনি, তিনি উপযুক্ত সময় সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন– তবে এতে কোনসন্দেহ নেই, দাবী দাওয়ার পর যেখানে তাঁর পৌছার ছিল, সে সর্বশেষ লক্ষ্যেই তিনি পৌছে গিয়েছিলেন।

সুস্পষ্ট বাণী ও চ্যালেঞ্জ ঘোষণা

মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী ১৯০১ সনে এ কথার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। মির্যা সাহেব স্বীয় রচনাবলীতে স্পষ্টভাবে এ কথা লিখতে

---

২. হাকীকাতুন নবুওয়ত, প্রধম খণ্ড : মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমূদ, পৃ-১২৪

লাগলেন। 'আরবাঈন'[৩] নামে তাঁর গ্রন্থমালার যে সংকলন রয়েছে, সেটি এক নতুন দায়িত্বের ঘোষণায় পূর্ণ। মির্যা সাহেবের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিনের পর দিন বেড়েই চলল। ১৯০২ সনে তিনি 'তোহফাতুন নদওয়া' নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এটি রচনা করেছিলেন মজলিসে নদওয়াতুল ওলামার সদস্যবৃন্দ ও অমৃতসরে (১৯০২ ঈসায়ী) নদওয়ার এজলাসে শরীক হওয়ার জন্য আগত ওলামায়ে কেরামকে উদ্দশ করে। মির্যা সাহেব এ পুস্তিকাটিতে লেখেন :

"আমি বার বার বর্ণনা করেছি, যে কথাগুলো আমি শোনাচ্ছি, নিশ্চিতভাবে তা আল্লাহর কালাম। যেমন কুরআন ও তৌরিত আল্লাহর কালাম।

আর আমি আল্লাহর জিল্লী[৪] ও বুরুযী[৫] নবী। দীনী বিষয়ে আমার অনুকরণ করা সকল মুসলমানের ওয়াজিব। প্রত্যেক মুসলমান– যার কাছে আমার দাওয়াত পৌঁছেছে, যদিও সে মুসলমান, কিন্তু আমাকে নিজের মীমাংসাকারী মনে করে না, মসীহ মওউদ মনে করে না এবং আমার ওহীকে আল্লাহর পক্ষ থেকেও মনে করে না, আসমানে তাকে পাকড়াও করা হবে। কেননা, যে বিষয় ঠিক সময়ে তার গ্রহণ করা উচিত ছিল, সে তা ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি শুধু এতটুকু বলছি না যে, যদি আমি মিথ্যাবাদী হতাম তবে ধ্বংস হয়ে যেতাম; বরং আমি এতটুকুও বলছি, মূসা, ঈসা, দাউদ ও আ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় আমি সত্যবাদী। আমাকে সত্যবাদী প্রমাণিত করার জন্য আল্লাহ

---

৩. মির্যা সাহেব প্রথমে পাঠকদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন, চল্লিশটি গ্রন্থ রচনা করবেন, কিন্তু চারটির পর এ ধারাবাহিকতা তিনি বন্ধ করে দেন। এর কারণ তিনি নিজে বর্ণনা করেন : মূলত তা-ই হয়েছে, যা আমি ইচ্ছা করেছিলাম। এজন্য গ্রন্থের ধারা আমি চার সংখ্যায় শেষ করেছি, আর ভবিষ্যতে কখনো তা প্রকাশ হবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা প্রথমে পঞ্চাশ নামায ফরয করেছিলেন, অতঃপর সহজ করার জন্য পঞ্চাশের স্থানে পাঁচকেই নির্ধারণ করেন। তেমনি আমিও পরওয়ারদিগারের নিয়ম অনুযায়ী চল্লিশের স্থানে চার নির্ধারণ করছি।-আরবাঈন, (৪) পৃ-১৪)

৪. ফয়েযে মুহাম্মদী থেকে ওহী পাওয়াকে মির্যা সাহেব জিল্লী নবুয়ত দ্বারা তা'বীর করেন। দ্রষ্টব্য : হাকীকতুল ওহী, পৃ-২৮

৫. এক গলতী কা ইযালা'য় মির্যা সাহেব লিখেছেন : সে নিজের অস্তিত্ব থেকে নয়; বরং স্বীয় নবীর প্রস্রবণ থেকে নেয়। আর নিজের, রবং তাঁরই জালানের জন্য। এ জন্যেই আসমানে তাঁর নাম মুহাম্মদ ও আহমদ। এর অর্থ হলো এই যে, মুহাম্মদের নবুওয়ত শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ পেয়েছেন, তবে তা বুরুযীভাবে আর তা অন্য কেউ নয়।– (পৃ-৫)

তায়ালা দশ হাযারের বেশী নিশানা দেখিয়েছেন। কুরআন আমার সাক্ষ্য দিয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার সাক্ষ্য দিয়েছেন, এটাই যার সময়। পূর্ববর্তী নবীগণ আমার আগমনের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআনও আমার আসার সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে, যা এটাই। আমার পক্ষে আসমানও সাক্ষ্য দিয়েছে, যমীনও। এমন কোন নবী নেই, যিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেননি।"[৬]

এমনিভাবে 'হাকীকতুল ওহী' পুস্তকে লিখেছেন :

"সারকথা, এত অধিক পরিমাণ ওহীয়ে এলাহী ও গায়েবী বিষয়াবলীর ব্যাপারে এ উম্মতের মাঝে আমিই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমার পূর্বে যে পরিমাণ আওলিয়া, আবদাল ও কুতুব ও উম্মতের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছেন, তাদের এ নেয়ামত এত পরিমাণ দেওয়া হয়নি।[৭] সুতরাং নবী নামটি পাওয়ার জন্য আমিই নির্ধারিত। অন্য কেউ এ নাম পাওয়ার যোগ্য নয়।"[৮]

মির্যা সাহেবের পরবর্তী রচনাবলী এ ধরনের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিতে পূর্ণ। এ সংক্ষিপ্ত পুস্তকে এ সব একত্রিত করা সম্ভব নয়। বিস্তারিত বিবরণ জানা ও তাহকীক করার প্রয়োজন হলে মির্যা সাহেবের গ্রন্থ 'হাকীকাতুল ওহী' এবং মির্যা বশীর উদ্দীনের 'হাকীকাতুন নবুয়ত' অধ্যয়ন করতে হবে।

স্বতন্ত্র নবুয়ত

মির্যা সাহেবের রচনাবলী থেকে এ কথাও প্রতীয়মান, তিনি নিজের স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী একজন নবী হওয়ারও প্রবক্তা ছিলেন। তিনি 'আরবাঈন' পুস্তকে শরীয়তওয়ালা নবীর সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন যে, যার ওহীর মাঝে আদেশ ও নিষেধ থাকে এবং তা কোন আইন কানূন নির্ধারিত করে। যদিও এ আদেশ ও নিষেধ পূর্ববর্তী কোন কিতাবে ইতিপূর্বে এসে থাকে। তাঁর নিকট

---

৬. তোহফাতুন নদওয়া, পৃ-৪

৭. এটা মির্যা সাহেবের দাবী মাত্র। নিরেট মূর্খতা ও ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তিনি এ দাবী করেছেন। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে এত অধিক পরিমাণে আওলিয়ায়ে কেরাম অতিবাহিত হয়েছেন (যার সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কারুর জানা নেই), যাদের কাছে বৃষ্টির ন্যায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও রূহানী ফয়েয পৌছেছে। তবে তাদের মাঝে কেউ একে ওহীয়ে এলাহীর নাম দেনি বা এ দাবীও উত্থাপন করেননি।

৮. হাকীকতুল ওহী, পৃ-৩৯১

শরীয়তওয়ালা নবীর জন্য এরূপ শর্ত নেই যে, তিনি পুরোপুরি নতুন বিধান নিয়ে আসবেন। এরপর তিনি পরিষ্কারভাবে দাবী উত্থাপন করেন : এ সংজ্ঞা অনুযায়ী তিনি শরীয়তওয়ালা একজন স্বতন্ত্র নবী। তিনি লেখেন :

"এ ছাড়া এ কথাও বুঝতে চেষ্টা করো, শরীয়ত কী বস্তু? যিনি স্বীয় ওহী দ্বারা কিছু আদেশ-নিষেধ বর্ণনা করেছেন এবং নিজের উম্মতের জন্য একটি আইন নির্ধারিত করেছেন, তিনিই সাহেবে শরীয়ত বা শরীয়ত প্রবর্তক হয়ে গেছেন। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী আমাদের প্রতিপক্ষগণ পরাজিত। কারণ, আমার ওহীতে আদেশ রয়েছে, নিষেধ ও রয়েছে। যেমন : এই এলহাম-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَالِكَ اَزْكٰى لَهُمْ

বারাহীনে আহমদিয়ায় এর উল্লেখ রয়েছে। এতে আদেশও রয়েছে, নিষেধও। এর উপর তেইশ বছর সময়ও অতিবাহিত হয়ে গেছে। এভাবে এখনো আমার ওহীতে 'আমর'ও হয়, 'নাহী'ও হয়। আর যদি বলো, শরীয়ত দ্বারা ঐ শরীয়ত বোঝানো হয়েছে, যাতে নতুন বিধান রয়েছে, তবে তা বাতিল এবং ভ্রান্ত ধারণা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى

অর্থাৎ, কুরআনী শিক্ষা তৌরিতেও রয়েছে।"[৯]

শরীয়তের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিধান পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে সুস্পষ্ট ভাষায় রহিত ঘোষণা করে দেওয়াও এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তিনি নিজেকে সাহেবে শরীয়ত ও আদেশ নিষেধের অধিকারী একজন স্বতন্ত্র নবী মনে করতেন, যিনি কুরআনী শরীয়ত রহিত করতে পারেন। যেমন, জিহাদের ন্যায় কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উদ্ধৃত একটি বিধান– যার উপর উম্মতের ধারাবাহিকভাবে আমল জারি রয়েছে এবং যার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে : "আল জিহাদু মাযিন ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাহ" নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং একে রহিত আখ্যা দেওয়া এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জিহাদ রহিত ও নিষিদ্ধ করার

৯. আরবাঈন (৪), পৃ-৭

ব্যাপারে এখানে শুধু একটি উদ্ধৃতি দেওয়াই যথেষ্ট হবে। তিনি 'আরবাঈন'-এর টীকায় লিখেছেন :

"জিহাদ অর্থাৎ দীনী লড়াইয়ের কঠোরতা আল্লাহ তায়ালা দিনের পর দিন কমিয়ে দিয়েছেন। হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কালে এত কঠোর ছিল যে, ঈমান আনাও কতল থেকে বাঁচাতে পারত না, দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও হত্যা করে দেওয়া হত। অতঃপর আমাদের নবী (সা.)-এর সময় শিশু, বয়োবৃদ্ধ ও মহিলাদের হত্যা করা হারাম করা হয়েছে, আর কোন কোন সম্প্রদায়ের জন্য ঈমানের স্থানে শুধু জিযিয়া দিয়ে শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া মেনে নেওয়া হয়েছে। অতঃপর মসীহ্ মওউদের সময়ে স্থায়ীভাবে জিহাদের বিধান মওকুফ করে দেওয়া হয়েছে।"[১০]

নবুওয়ত অমান্যকারীদের কাফের আখ্যা দেওয়া এবং তাদের সাথে কাফেরের ন্যায় ব্যবহার

নবুয়তের দাবীর স্বাভাবিক ও যৌক্তিক পরিণতি এই যে, ঐ সব মানুষ যারা এই নতুন নবুওয়তের উপর ঈমান রাখবে না, তাদের কাফের আখ্যা দেওয়া হবে। খোদ মির্যা সাহেবও স্বীকার করেছেন, স্বতন্ত্র শরীয়তপ্রাপ্ত নবীদেরই একমাত্র অধিকার আছে যে, তার অমান্যকারীদের কাফের আখ্যা দিতে পারেন।

তিনি লেখেন :

"এ সূক্ষ্ম কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, নিজের দাবী অমান্যকারীকে কাফের বলা– এ শুধু নবীদের শান; যাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন শরীয়ত ও নতুন বিধান নিয়ে আসেন, কিন্তু সাহেবে শরীয়ত ব্যতীত যারা এলহামপ্রাপ্ত এবং মোহাদ্দেস আল্লাহর দরবারে তাদের মর্যাদা যত উচ্চমানের-ই হোক না কেন, তাদের অস্বীকার করলে কেউ কাফের হবে না।"[১১]

মির্যা সাহেবের উপর যাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের কাফের আখ্যা দিয়ে তিনি নিজের রচনাবলী পূর্ণ করে রেখেছেন। এখানে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি পেশ করা হল। মির্যা সাহেব বারাহীনে আহমদিয়ার পঞ্চম খণ্ডে লিখেছেন :

---

১০. আরবাঈন : নং-৪, টীকা, পৃ-১৫। জিহাদ রহিত ও নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে মির্যা সাহেবের সুস্পষ্ট বর্ণনা তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

১১. তিরয়াকুল কুলুব, পৃ-১৩০, টীকা

"এ দিনগুলোতেই আসমান থেকে একটি নতুন দলের গোড়াপত্তন করা হবে, আর আল্লাহ স্বীয় মুখে এ দলের সহযোগিতা করার জন্য একটি ধ্বনি বাজাবেন। এ ধ্বনির আওয়াজে সকল ভাল মানুষ এ দলের দিকে দৌড়ে আসবে। তবে ঐ সকল মানুষ ব্যতীত যারা সৃষ্টিগতভাবে খারাপ; দোযখ পূর্ণ করার জন্য যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।"[১২]

মির্যা সাহেব ১৯০০ সনের ২৫ মে যে এলহাম প্রচার করেছেন, তাতে বলা হয়েছে :

"আমার এলহাম হয়েছে, যে ব্যক্তি তোমার অনুকরণ করবে না এবং তোমার বায়আতে দাখিল হবে না, খোদা ও তাঁর রসূলের আইন অমান্যকারী এ ব্যক্তি হবে জাহান্নামী।"[১৩]

অপর এক জায়গায় বলেছেন :

"আল্লাহ তায়ালা আমার উপর একথা প্রকাশ করেছেন যে, ঐ ব্যক্তি যার কাছে আমার দাওয়াত পৌছেছে আর সে তা গ্রহণ করেনি সে ব্যক্তি মুসলমান নয়।"[১৪]

হাকীকাতুল ওহীতে বলেছেন :

"কুফর দুই ধরনের। (এক), কোন ব্যক্তি ইসলামকেই অস্বীকার করে এবং আঁ হযরত (সা.)-কে আল্লাহর রসূলই মানে না। (দুই) এ ধরনের কুফর যে, সে মসীহ মওউদকে মানে না। আর প্রমাণ পূর্ণ করা সত্ত্বেও তাকে মিথ্যাবাদী মনে করে। যাকে মানা ও সত্যবাদী জ্ঞান করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল তাকিদ করেছেন এবং পূর্ববর্তী নবীদের কিতাবেও জোর তাকিদ রয়েছে। সুতরাং সে আল্লাহ ও রসূলের আইন অমান্যকারী, তাই সে কাফের। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ উভয় প্রকার কুফর এক প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, যে ব্যক্তি চেনার পরেও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মানে না, সে কুরআন হাদীসের স্পষ্ট বাণী অনুযায়ী আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকেও মানে না।"[১৫]

---

১২. বারাহীনে আহমদিয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃ-৮২, ৮৩

১৩. মি'আরুল আখবার, পৃ-৮ ('কাদিয়ানী মাযহাব' থেকে সংগৃহীত)

১৪. যিকরুল হাকীম (২) পৃ–২৪ : ডঃ আবদুল হাকীম। আল ফযল পত্রিকা থেকে গৃহীত, তাং ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৫ ঈসায়ী।

১৫. হাকীকতুল ওহী, পৃ-১৭৯-১৮০

এ হচ্ছে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বুনিয়াদী বিশ্বাস। কাদিয়ানী জামাতের আমীর ও নেতা মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমূদ তাঁর 'আয়েনায়ে সদাকাত' গ্রন্থে বলেছেন :

"সে মুসলমান যে হযরত মসীহ মওউদের বায়আতে শামিল হয়নি- যদিও সে হযরত মসীহ মওউদের নাম না শুনে থাকুক- সে ব্যক্তি কাফের এবং সে ইসলামের আওতা বর্হিভূত।"[১৬]

এ ধারায় বশীর উদ্দীন সাহেব ও কাদিয়ানী জামাতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের স্পষ্ট কথা এবং সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি একত্রিত করা সম্ভব নয়। এর জন্য মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের গ্রন্থ "কালেমাতুল ফসল" অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

যে সব মুসলমান আহমদী জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের কাফের মনে করার কারণে কাদিয়ানী জামাতের লোকেরা তাদের উপর কাফেরদের যাবতীয় ফেকহী আহকাম জারি করেছেন। যেমন, কাদিয়ানীদের নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে, তারা যেন মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন না করে।

মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমূদ এক ভাষণে বলেছেন : 'হযরত মসীহ মওউদের নির্দেশ এবং কঠোর নির্দেশ, কোন আহমদী যেন গায়রে আহমদীর কাছে নিজের মেয়ে বিবাহ না দেয়। এ হুকুম মানা সকল আহমদীর জন্য ফরয।'[১৭]

'আনোয়ারে খেলাফতে' তিনি বলেছেন : "তাঁর (মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব) কাছে এক ব্যক্তি বার বার জিজ্ঞেস করেছে এবং অনেক ধরনের সমস্যাও দেখিয়েছে, কিন্তু তিনি তাকে এ কথাই বলেছেন, কন্যাকে বসিয়ে রাখো, তবুও গায়বে আহমদীর কাছে দিও না। হযরতের ওফাতের পর সে গায়রে আহমদীর কাছে মেয়ে বিবাহ দিয়েছে, এ জন্য প্রথম খলীফা হযরত হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব তাকে আহমদীদের ইমামত এবং জামাত থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছেন। সে বারংবার তওবা করা সত্ত্বেও স্বীয় খেলাফতের ছয় বছরকাল যাবত তার তওবা কবুল করেননি।"[১৮] এক স্থানে এ নির্দেশের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

---

১৬. আয়েনায়ে সদাকাত, পৃ-৩৫ ('কাদিয়ানী মাযহাব' থেকে সংকলিত)

১৭. বারাকাতে খেলাফত, কাদিয়ানের খলীফা মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমূদ সাহেবের বক্তৃতামালা, পৃ-৭৫ ('কাদিয়ানী মাযহাব' থেকে সংকলিত)

১৮. আনওয়ারে খেলাফত, পৃ-৯৩, ৯৪

'আমাদের মুকাবিলায় গায়রে আহমদীদের সে অবস্থা, যে অবস্থা কুরআনুল করীম একজন মুমিনের মুকাবিলায় কিতাবীদের ঘোষণা দিয়েছে। কুরআন এ শিক্ষা দিচ্ছে, একজন মুমিন কোন আহলে কিতাব নারীকে বিবাহ করতে পারে, কিন্তু একজন মুমিন নারীর কোন কিতাবীর কাছে বিবাহ হতে পারে না। তেমনি একজন আহমদী পুরুষ গায়রে আহমদী স্ত্রীলোককে বিবাহে আবদ্ধ করতে পারে, কিন্তু একজন আহমদী স্ত্রীলোক শরীয়তের বিধান অনুসারে গায়রে আহমদী পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। হুযুর (মির্যা সাহেব) বলেন : 'গায়রে আহমদীদের মেয়ে বিবাহ করায় কোন অসুবিধা নেই। কেননা, আহলে কিতাব নারীদের সাথেও বিবাহ জায়েয আছে; বরং এতে কল্যাণ রয়েছে। কারণ এতে অপর একজন মানুষ হেদায়েত পেল। স্বীয় কন্যা কোন গায়রে আহমদীর কাছে দেওয়া উচিত নয়। জুটে গেলে নেওয়ায় কোন অসুবিধা নেই, দেওয়ায় পাপ রয়েছে।'[১৯]

অনুরূপভাবে, গায়রে আহমদীদের পেছনে নামায পড়াও তাদের নিকট বৈধ নয়। খোদ মির্যা সাহেব 'আরবাঈন'-এর টিকায় লিখেছেন :

'এ কালামে এলাহী থেকে প্রতীয়মান হয়, যারা আমাদের কাফের বলে এবং যারা মিথ্যার রাস্তা গ্রহণ করেছে, তারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। এ জন্য তারা এর যোগ্য নয় যে, আমার জামাতের কেউ তাদের পেছনে নামায পড়বে। জীবিত কি মৃতের পেছনে নামায পড়তে পারে? সুতরাং স্মরণ রাখো, যে ভাবে আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের পেছনে নামায আদায় করা তোমাদের উপর হারাম, তোমাদের উপর হারাম এবং অবশ্যই হারাম, যারা আমাদের কাফের বলে, যারা মিথ্যাবাদী অথবা সন্দেহকারী।'[২০]

এমনিভাবে মুসলমানদের জানাযার নামায পড়াও তাদের জন্য নিষিদ্ধ। 'আল-ফযল' পত্রিকায় (১৫ই ডিসেম্বর ১৯২১) রয়েছে : 'হযরত মির্যা সাহেব স্বীয় পুত্র (ফযলে আহমদ সাহেব মরহুম)-এর জানাযা এজন্য পড়েননি, তিনি গায়রে আহমদী ছিলেন। মির্যা বশীর উদ্দীন আহমদ এক চিঠিতে যা 'আল-ফযল' পত্রিকায় (১৩ই এপ্রিল, ১৯২৬ ঈসায়ী) মুদ্রিত হয়েছে, আমার এ আকীদা, যারা গায়রে আহমদীদের পেছনে নামায পড়ে, তাদের জানাযা জায়েয নেই। কেননা, আমার নিকট সে আহমদী নয়। তিনি এ পর্যন্তও ফতোয়া

---

১৯. আল হেকাম, ১৪ এপ্রিল, ১৯০৮ ঈসায়ী ('কাদিয়ানী মাযহাব' থেকে সংকলিত)

২০. আরবাঈন (৩), পৃষ্ঠা-৩৪ (টীকা)

দিয়েছেন, গায়রে আহমদী শিশুরও জানাযা পড়া বৈধ নয়।[২১] যেমনিভাবে ঈসায়ী শিশুর জানাযা পড়া যায় না, যদিও সে মাসুম-ই হয়ে থাকে; তদ্রূপ কোন অ-আহমদী শিশুর জানাযাও পড়া যায় না।[২২] এ নির্দেশ পালনার্থই চৌধুরী জফরুল্লাহ খান (যিনি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন) মিষ্টার জিন্নাহ'র জানাযায় উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও অংশ গ্রহণ করেননি।

এ আকীদার ফল হচ্ছে, যে সব ইবাদত ও ফরযিয়াত কাদিয়ানী সিলসিলায় দাখিল হওয়ার পূর্বে আদায় করা হয়েছিল, সেগুলো বাতিল বলে গণ্য করা হয়। আর এ-ও গণ্য করা হয়, এর দ্বারা ফরয আদায় হয়নি। যেমন, এক ফতোয়ার জওয়াবে লেখা হয়েছে : যে ব্যক্তি এমন সময়ে হজ্জ আদায় করেছে, হযরত মির্যা সাহেবের দাবী পুরোপুরিভাবে প্রচারিত হয়ে গেছে আর দেশের সর্বসাধারণের উপর পরিপূর্ণ প্রমাণ পেশ করা হয়ে গেছে এবং হুযুর (মির্যা সাহেব) গায়রে আহমদী ইমামের পেছনে নামায পড়তে নিষেধ করে দিয়েছেন, তবে তার ফরয আদায় হয়নি।'[২৩]

আত্মার পুনর্জন্মের আকীদা

মির্যা সাহেবের কোন কোন লেখা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তিনি আত্মার পুনর্জন্মেরও প্রবক্তা ছিলেন। তার নিকট আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের আত্মা ও স্বভাব অপরের দেহে প্রবশে করে আসছে। 'তিরয়াকুল কুলূব' পুস্তকে রয়েছে :

'সারকথা : যেমনিভাবে সূফীদের নিকট এ কথা মেনে নেওয়া হয়েছে, অস্তিত্বের স্তর আবর্তন করে থাকে; এমনিভাবে ইবরাহীম (আ.) স্বীয় চরিত্র ও স্বভাব এবং আত্মিক সামঞ্জস্যের দিক থেকে, মৃত্যুর প্রায় আড়াই হাযার বছর পর পুনরায় আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহর ঘরে জন্ম নিয়েছে এবং মুহাম্মদ নামে পরিচিত হয়েছে।'[২৪]

অন্য এক গ্রন্থে লিখেছেন :

'এ স্থানে এই সূক্ষ্ম কথাও স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের নবী (সা.)-এর আত্মাও ইসলামের ভেতরগত দুরবস্থার সময় সর্বদা প্রকাশ পেয়ে থাকে। আর

২১. 'আল-ফযল', বর্ষ-৯, সংখ্যা-৭২
২২. 'আল-ফযল', কাদিয়ান, বর্ষ-১০, সংখ্যা-৩২
২৩. 'আল হেকাম', কাদিয়ান, ৭ মে, ১৯৩৪
২৪. পৃ-১৫৫ টীকা

হাকীকতে মুহাম্মদিয়ার প্রবেশ হয়ে থাকে কোন কামেল অনুগত বান্দার মধ্যে। আর হাদীসে যে এসেছে : মাহদী পয়দা হবেন, তার নাম আমারই নাম হবে, তার চরিত্র আমারই চরিত্র হবে– যদি এ হাদীসগুলো সহীহ হয়, তবে এর দ্বারা ঐ আত্মিক অবতরণের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।'[২৫]

'আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম'-এর এক জায়গায় লিখেছেন :

'স্বর্গীয় ইংগিতের মাধ্যমে আমার উপর একথা প্রকাশ করা হয়েছে, খ্রিষ্টান থেকে যে ধ্বংসাত্মক হাওয়া দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে, হযরত ঈসা (আ.)-কে এর সংবাদ দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তার আত্মায় রূহানী অবতরণের জন্য কম্পনের সৃষ্টি হল। এরপর আত্মা খুব জোশে এসে এবং নিজের উম্মতকে ধ্বংসের গহ্বরে চলতে দেখে দুনিয়ায় স্বীয় স্থলাভিষিক্ত ও নমুনা প্রার্থনা করল; যে তার এমন নমুনা হবে, যেন সে-ই। সুতরাং তাঁকে আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একজন নমুনা দান করলেন এবং এ নমুনায় মসীহের সাহসিকতা, চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা অবতীর্ণ হল এবং তার ও মসীহের মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করে দেওয়া হল। যেন এক-ই মুক্তার দুটো টুকরো বানানো হল, আর মসীহের মনোযোগ তার অন্তরে আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিল আর এর মধ্যে অবস্থান করে স্বীয় চাহিদা পূর্ণ করতে চাইল। সুতরাং এ দিক থেকে তার অস্তিত্ব মসীহের অস্তিত্বে পরিণত হল এবং মসীহের ইচ্ছাশক্তি তার মাঝে অবতীর্ণ হল। এ অবতরণকেই রূপকভাবে মসীহের অবতরণ ধার্য করা হল।'[২৬]

নবীর দুইবার নওবুয়তপ্রাপ্তি

মির্যা সাহেবের এ-ও আকীদা এবং ঘোষণা যে, হুযুর (সা.)-এর দুইবার নবুয়ত প্রাপ্তি ঘটেছে। এখানে তারই লিখা মূল আরবী ও এর তরজমার দুটো এবারত নকল করা যাচ্ছে :

واعلم ان نبينا صلى الله عليه وسلم كما بعث فى الالف الخامس كذالک بعث فى اخرالالف السادس باتخاذ بروز المسيح الموعود

২৫. আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃ-৩৪৬

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ-২৫৪, ২৫৫

এবং জেনে রাখো, আমাদের নবী (সা.) যেমনিভাবে পঞ্চম সহস্রে প্রেরিত হয়েছেন, তেমনি মসীহ, মওউদের বুরূযী আকৃতি গ্রহণ করে ষষ্ঠ সহস্রের শেষের দিকে প্রেরিত হয়েছেন।[২৭]

কিছু সম্মুখে অগ্রসর হলে লিখেছেন : দ্বিতীয় বারের নবুওয়তপ্রাপ্তি প্রথম বারের নবুওয়তপ্রাপ্তি থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী, পরিপূর্ণ ও উজ্জ্বল।

بل الحق ان روحانيته عليه السلام كان فى اخر الالف السادس اعنى فى هذه الايام اشد واقوى واكمل من تلك الاعوام بل كالبدر التام

বরং সত্য হল, হুযুর (সা.)-এর আধ্যাত্মিকতা ষষ্ঠ সহস্রের শেষের দিকে অর্থাৎ এ দিনগুলোতে প্রথম বছরগুলোর তুলনায় শক্তিশালী, পরিপূর্ণ ও অত্যন্ত ভারী; বরং চৌদ্দ তারিখের রাতের চাঁদের ন্যায়।[২৮]

মির্যা সাহেবের নিজেকে বড় জ্ঞান করা

নবুওয়ত ও নবুওয়তের পরিপূর্ণতার ব্যাপারে মির্যা সাহেবের নিজেকে বড় জ্ঞান করা- যা একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার- এত পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল যে, তিনি প্রথমে নিজেকে সকল আম্বিয়ার সমমানের ও সমগুণের মনে করতেন। 'নুযূলে মসীহে' বলেন :

آنچہ داداست ہر نبی راجام-دادآں جام رامرا بہ تمام

প্রত্যেক নবীকে যে পেয়ালা দিয়েছিলেন, সে পেয়ালা আমাকেও পুরোপুরিভাবে দিয়েছেন।

অতঃপর অগ্রসর হয়ে বলেন :

انبياء گرچہ بودہ اند بسے- من بہ عرفاں نہ کمترم ز کسے

আম্বিয়া যদিও ছিলেন বহু, আল্লাহর পরিচয়ের দিক থেকে আমি কারুর থেকে কম ছিলাম না।[২৯]

অতঃপর আরো অগ্রসর হয়ে নিজেকে তিনি আম্বিয়ায়ে কেরামের গুণাবলীর পরিপূর্ণ সত্তা বলে মনে করেন। এ গ্রন্থেই তিনি বলেছেন :

---

২৭. খুতবায়ে এলহামিয়া, পৃ-১৮০

২৮. প্রাগুক্ত-১৮১

২৯. পৃ-৯৯

آدم نیز احمد مختار-در برم جای می ابرار

আমার আদম এবং স্বাধীন আহমদ, আমার উপরে রয়েছে সকল ভাল মানুষের জামা[৩০]

অতঃপর এগিয়ে গিয়ে বলেছেন :

زندہ شد ہر نبی با آمدنم-ہر رسولے نہاں بہ پیرہنم

জীবিত হয়েছেন সকল নবী আমার আগমনের দ্বারা, সকল রসূল-ই লুক্কায়িত আছেন আমার পোসাকে[৩১]

শুধু তাই নয় বরং তাঁর আকীদা ও ঘোষণা হলো, তাঁর দ্বারা আদমের বংশধরের পরিপূর্ণতা এসেছে আর তাঁকে ব্যতীত মানবতার এই ফুলবাগান অপূর্ণ ছিল। তাঁর কবিতা :

روض ءآدم کہ تھا وہ نامکمل اب تلک-میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگ وبار

মানুষের গুলবাগিচা, যা ছিল আজ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ, আমার আসার দ্বারা তা হলো ফুলে ফলে পরিপূর্ণ।[৩২]

তাঁর এ খেয়ালও জানা যায়, নবুওয়তের গুণাবলী ও আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণতা সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে উন্নতি করেছে। যার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে তাঁর মাঝ দিয়ে। 'খুতবায়ে এলহামিয়া'য় তিনি লিখেছেন :

এমনিভাবে আমাদের নবী করীম (সা.)-এর রূহানিয়্যাত পঞ্চম সহস্রে সংক্ষিপ্ত গুণাবলী নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আর সে সময়টা রূহানিয়্যাতের উন্নতির সর্বশেষ প্রান্ত ছিলো না; বরং এর গুণাবলীর প্রথম ধাপ ছিলো। অতঃপর এ আধ্যাত্মিকতা ষষ্ঠ সহস্রের শেষের দিকে অর্থাৎ এখন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে। যেমন, আদম ষষ্ঠ দিনের শেষে আহসানুল খালেকীন আল্লাহ তায়ালার অনুমতিতে সৃষ্টি হয়েছেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের আধ্যাত্মিকতা নিজের প্রকাশের পরিপূর্ণতার জন্য এবং স্বীয় নূরের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য একটি প্রকাশ মাধ্যম গ্রহণ করেছেন, যেমন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় ভাস্বরগ্রন্থে ওয়াদা করেছেন। সুতরাং আমিই সেই প্রকাশ মাধ্যম, আমিই সেই প্রতিশ্রুত জ্যোতি।[৩৩]

---

৩০. পৃ-৯৯
৩১. পৃ-১০০
৩২. বারাহীনে আহমদিয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃ-১১৩
৩৩. খুতবায়ে এলহামিয়া, পৃ-১৭৭, ১৭৮

'এ'জাযে আহমদী' গ্রন্থে তিনি নিজের মোজেযা ও নির্দেশনাবলীকে নববী মোজেযার উপর প্রাধান্য দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন :

له خسف القمر المنير وان لى -

غسا القمران المشرقان اتنكر؟

তিনি নিজেই এর তর্জমা করেছেন এভাবে : এবং তার জন্য চন্দ্রগ্রহণের নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে আর আমার জন্য চন্দ্র সূর্য উভয়টির; এখনো তুমি অস্বীকার করবে?'[৩৪]

মির্যা সাহেবের এ বাণীগুলো এ কথার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, তাঁর অন্ধভক্ত ও স্থলাভিষিক্তগণ এর উপর বড় ধরনের একটি ভিত্তি নির্মাণ করে ফেলবে। যেমনটি সর্বদা হয়েছে ফের্কা ও সম্প্রদায়ের ইতিহাসে। যেমন তাঁর বহু অনুসারী তাঁকে অধিকাংশ নবীদের উপর স্পষ্ট ভাষায় শ্রেষ্ঠত্ব দিতে লাগলেন। খোদ মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ সাহেব 'হাকীকতুন নবুওয়ত' গ্রন্থে লিখেছেন :

'দুনিয়ায় বহু নবী অতিবাহিত হয়েছেন। তবে তাদের শাগরেদগণ মোহাদ্দাসের স্তর থেকে উপরে অগ্রসর হতে পারেননি, শুধু আমাদের নবী আলাইহিস সালাম ব্যতীত। তাঁর অনুগ্রহ এতটুকু বিস্তার লাভ করেছে যে, তাঁর শাগরেদদের মধ্যে অসংখ্য মোহাদ্দাস ছাড়াও একজন নবুওয়তের দর্জা পেয়েছেন। আর তিনি যে শুধু নবী হয়েছেন তা-ই নয়; বরং যার অনুসরণ করেছেন তাঁর যাবতীয় গুণাবলী ছায়াস্বরূপ অর্জন করে অনেক বড় বড় নবীদের থেকেও অগ্রসর হয়ে গেছেন।[৩৫]

মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ সাহেবের অন্ধ অনুসারীগণ এ কথাটাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। 'আল ফযল, কাদিয়ান', (বর্ষ-১৪, সংখ্যা-৮৫) এ রয়েছে :

"হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন। মর্যাদার দিক থেকে তাঁর স্তর ছিল, রসূলে করীম (সা.)-এর শাগরেদ ও প্রতিবিম্ব হওয়ার। অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্য থেকে অনেকের চেয়ে তিনি বড় ছিলেন; সম্ভবত সকলের চেয়ে বড়।[৩৬]

---

৩৪. এ'জাযে আহমদী, পৃ-৭১

৩৫. হাকীকতুন নবুওয়ত, পৃ-২৫৭

৩৬. তারিখ-১৯ এপ্রিল, ১৯২৭ ('কাদিয়ানী মাযহাব' থেকে সংকলিত)

তৃতীয় অধ্যায়

মির্যা সাহেবের জীবনীর উপর এক নযর

প্রথম পরিচ্ছেদ

মির্যা সাহেবের জীবনাচার : দাওয়াতের উন্নতি ও জনসাধারণের গমনাগমন আরম্ভ হওয়ার পর

মির্যা সাহেবের প্রাথমিক অবস্থা

মির্যা গোলাম আহমদ স্বীয় যিন্দেগী শুরু করেছিলেন অভাব ও দরিদ্রতার মধ্য দিয়ে। জমিদারীর একটি বড় অংশ হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল। আয়ের অন্য কোন পথ ছিল না। তিনি নিজেই এ সময়ের ব্যাপারে লিখেছেন :

'আমার শুধু নিজের দস্তরখান ও রুটির চিন্তা ছিল।'[১] পঁচিশ বছর যাবত তিনি অপরিচিত ও অসহায় অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেন। ঐ সময়ের দরিদ্রতা ও অসহায়ত্বের চিত্র তিনি নিজেই এঁকেছেন। তিনি বলেন :

'এ সময়ে মূলত আমি ঐ মৃতের ন্যায় ছিলাম, যে শত শত বছর যাবত কবরে শায়িত, আর কেউ জানেও না এটা কার কবর?'[২]

এ অবস্থা তখনো ছিল, যখন মির্যা সাহেব একজন লেখক ও ইসলামের একজন উকিল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি একজন মুবাল্লিগ ও আধ্যাত্মিক মুরুব্বী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেন। তার পর তিনি 'মসীহ মওউদ এবং সর্বশেষে একজন স্বতন্ত্র পয়গম্বর' হিসেবে প্রকাশিত হন। এ সময় আর অবস্থায় বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এখন তিনি একটি সমর্থ ফের্কা ও বিত্তশালী শ্রেণীর আধ্যাত্মিক ইমাম। তাঁর কাছে সবদিক থেকে হাদিয়া তোহফা ও উপহারের সমুদ্র আছড়ে পড়ছিল। আর তিনি হাযারো মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। এ কথা স্পষ্ট যে, এ সব দৌলত, প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা একটি দীনী দাওয়াত ও আন্দোলনের রাস্তায়

---

১. নুযূলুল মসীহ, প্রথম সংস্করণ, পৃ-১১৮

২. হাকীকতুল ওহী'র পরিশিষ্ট, পৃ-২৮

এসেছিল। আর একটি দীনী জযবা-ই লোকদের ত্যাগ তিতিক্ষা ও মির্যা সাহেবের আর্থিক খেদমত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছিল। একজন ঐতিহাসিক ও জীবনীকার এবং একজন সমালোচক এ স্থানে লক্ষ্য করবেন, অবস্থার এ পরিবর্তন মির্যা সাহেবের যিন্দেগী এবং তাঁর মনোভাবের কী পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল? মির্যা সাহেব একটি বড় দীনী দাওয়াত নিয়ে এবং একটি অনেক বড় দাবী ও ঘোষণা সাথে নিয়ে (যার থেকে বড় দাবী ও ঘোষণা ধর্মীয় পরিভাষায় সম্ভব নয়) দাঁড়িয়েছিলেন। এজন্য এই দাওয়াত ও দাবীর সাথে তাঁর জীবনের কিরূপ সম্পর্ক তাই দেখার বিষয়। সরওয়ারে আলম, সাইয়েদুল আম্বিয়া (সা.)-এর পবিত্র জীবনের সাথে তুলনা করা ও এ ব্যাপারে তাঁর মুবারক নাম মাঝখানে আনা তো নিছক বে-আদবী এবং আদর্শ চরিত্রের কাছে অপরাধ বলে মনে হবে। এটি সেই সম্মানিত দরবার।

"জুনায়েদ (রহ.) ও বায়েযীদ (রহ.) ও নিঃশ্বাস হারিয়ে এখানে আসেন" কিন্তু যাঁরা কোন দীনী আন্দোলন ও দাওয়াতের পতাকাবাহী এবং নিজের যুগের ইমাম ও আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন, উম্মতে মুহাম্মদীর সে সকল সদস্যের জীবনের সাথে তুলনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

দীনী ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বদের জীবনাচার এবং চালচিত্র

ইসলামের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায়, যাঁরা নিজেদের যুগে দীনী দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের ঝাণ্ডা বহনকারী ছিলেন, যাঁরা নিজেদের জন্য নববী আদর্শ অনুসরণের রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন, আর যাঁদের আল্লাহ তায়ালা ঈমানের মিষ্টতা আস্বাদন করিয়ে ছিলেন, তাঁদের কাছে যে পরিমাণ লোকের সমাগম হতো, তাঁদের জন্য যে পরিমাণ ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য ও আনন্দময় জীবনের উপকরণ সঞ্চিত ছিল, ঠিক সে পরিমাণ-ই তাঁদের মাঝে খোদাভীতির প্রেরণা, অল্পে তুষ্ট থাকার আগ্রহ, ধন দৌলতের প্রতি নিরাসক্তি এবং পরকালের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছিল। তাঁদের পূর্ণ জীবন ও বিশ্বাস ও মূলনীতির পরিমণ্ডলে আবর্তিত ছিল যে, মূলত পরকালের জীবনই জীবন।

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشَ الْاٰخِرَةِ

(হে আল্লাহ, পরকালের আনন্দ ছাড়া আর কোন আনন্দ-ই নেই।)

সব জায়গায় দীনী ও আধাত্মিক ব্যক্তিদের ইতিহাসের এ রূপ-ই দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁরা এ দুনিয়ায় মুসাফিরের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করতেন। তাঁদের জীবনে সর্বদা রসূলের এ বাণী (অনুসরণীয়) থাকে :

مَالِىْ وَلِلدُّنْيَا وَمَا اَنَا وَالدُّنْيَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا (اَحْمَد ـ تِرمِذِىْ ـ اِبْن مَاجَه)

'দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমার উদাহরণ তো সে পথিকের ন্যায়, যে কিছু সময় একটি গাছের ছায়ায় আরাম করেছে, অতঃপর উঠে দাঁড়িয়েছে এবং ছেড়ে চলতে শুরু করেছে।'

তাঁদের অবস্থা তো সে রকমই থাকে, হযরত আলী (রা.)-এর একজন বন্ধু তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে যা বর্ণনা করেছেন :

يَسْتَوْحِشُ مِنَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا
وَيَسْتَانِسُ بِاللَّيْلِ وَظُلْمَتِهٖ كَانَ وَاللّٰهِ
غَزِيْرُ الدَّمْعَةِ طَوِيْلُ الفِكْرَةِ يُقَلِّبُ
كَفَّهٗ وَيُخَاطِبُ نَفْسَهٗ يُعْجِبُهٗ مِنَ اللِّبَاسِ
مَا خَشُنَ وَمِنَ الطَّعَامِ مَا جَشُبَ (صفة الصفوة)

"দুনিয়া ও দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি তাঁর অনাগ্রহ, রাতের অন্ধকারে তাঁর মন জমে উঠে, নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ, সর্বক্ষণ চিন্তা ও বেদনায় ডুবন্ত, সময়ের বহমান স্রোতের প্রতি আশ্চর্যান্বিত, নিজেকে সর্বদা প্রশ্নকারী, সাধারণ ও মোটা পোসাক তাঁর নিকট প্রিয়, স্বাভাবিক ও অল্প পয়সার খাবার তাঁর নিকট লোভনীয়।"

প্রথম যুগের আওলিয়ায়ে কেরাম এবং ইসলামের মর্যাদাসম্পন্ন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বদের আলোচনা এখানে বাদ দেওয়া হলো। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের কথাও এখানে ছেড়ে দেওয়া হলো, যিনি ছিলেন একজন খলীফায়ে রাশেদ। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর গোলামদের মধ্যে এরকম মর্যাদাশালী ও মহোত্তম সুলতান অতিবাহিত হয়েছেন, যাঁদের তাকওয়া খোদাভীতি, সহনশীলতা ও

পরহেযগারী, শাহী পোসাকে দরিদ্রসুলভ জীবনাচার এবং সুলতানী সিংহাসনে খেজুর পাতার মাদুরে বসার অভ্যাস ইতিহাসে এখনো স্মরণীয় ও মানবতার জন্য গর্বের পুঁজি হয়ে রয়েছে। নূরুদ্দীন যঙ্গী, সালাহুদ্দীন আইয়্যুবী[৩] নাসিরুদ্দীন মাহমুদ, মুজাফফর হালীম এবং সুলতান আওরঙ্গজেব আলমগীর যে ধরনের জীবন অতিবাহিত করেছেন, খোদাভীতি ও দরবেশীর তা এক উত্তম নমুনা। খোদ মির্যা সাহেবের সময়কালে এরকম ওলামায়ে রাব্বানী ও তরীকতপন্থী পীর মাশায়েখ বিদ্যমান ছিলেন, যাঁরা টাকার উপস্থিতিসহ রাত অতিবাহিত করা পাপ মনে করতেন। অতএব যা কিছু তাঁদের হাতে আসত, তা তাঁরা অভাবগ্রস্ত ও দুস্থদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। যাঁদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, যে পরিমাণ ভোগের উপকরণ তাঁদের কাছে বর্ধিত হয়ে যেতো, যে পরিমাণ মানুষের আনাগোনা তাঁদের কাছে বেড়ে যেতো, যে রকম হাদিয়া তোহফার বর্ষণ হতে থাকত, সে পরিমাণ তাঁদের আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া পরহেযগারী বর্ধিত হত। মির্যা সাহেবের সময়কালেই মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (রহ.), মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহ.), মাওলানা সাইয়েদ আবদুল্লাহ গযনবী (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ নাঈম ফিরিঙ্গী মহল্লীর ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মনীষীরা জীবিত ছিলেন, যাঁরা আয়েশী জীবন বর্জন করার মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.)-এর যোগ্য উত্তরসুরী হওয়ার এক বাস্তব নমুনা দুনিয়ার সামনে পেশ করেছেন।[৪]

নবুওয়তের সত্যতার একটি প্রমাণ

এ রকম পরহেযগারীর যিন্দেগী, যার শুরু থেকে শেষ অবধি কোন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না, প্রাচুর্য ও অনটন উভয় অবস্থায় একই রকম জীবনাচার এবং

---

৩. সুলতান জীবনীকার এবং তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তি কাযী ইবনে শাদ্দাদ লিখেছেন, 'সুলতান পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে শুধু ৪৭ দেরহাম ছেড়ে গেছেন। কোন দেশ, ঘর-বাড়ি, জমিদারী, বাগান, গ্রাম শস্যভূমি ছেড়ে যাননি। তাঁর কাফন দাফনে এক পয়সাও তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে ব্যয় হয়নি। সকল অর্থেই কর্জ করে লওয়া হয়েছে। কাফনের ব্যবস্থা করেছেন তাঁর উযীর ও সচিব কাযী ফাযেল কোন বৈধ উপার্জন থেকে। আর এটা ওই সুলতানের অবস্থা, যার কব্জায় ছিল সিরিয়া, মিসর, সুদান, ইরাক, হেজায ও আরব জাহানের পূর্ণ এলাকা।

৪. এর জন্য দেখা যেতে পারে 'নুযহাতুল খাওয়াতের,' অষ্টম খণ্ড।

দুনিয়ার ধন দৌলতের প্রতি নিরাসক্তি খোদ মির্যা সাহেবের কাছেও নবুওয়তে মুহাম্মদীর সত্যতার একটি নিদর্শন। তিনি লিখেছেন :

"অতঃপর যখন দীর্ঘকাল পর ইসলামের বিজয় সূচিত হল, তখন এ উন্নতি-অগ্রগতির মুহূর্তে কোন সম্পদ সঞ্চয় করেননি, কোন প্রাসাদ করেননি, স্মরণীয় কিছু নির্মিত হয়নি, ভোগবিলাসের কোন আসবাব ব্যবস্থা করা হয়নি, অন্য কোন ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জিত হয়নি; বরং যা কিছু এসেছে সব ইয়াতিম, অসহায়, বিধবা নারী ও ঋণগ্রস্তদের মাঝে ব্যয় হয়েছে এবং কখনো এক বেলাও উদরপূর্তি করে খাননি।"[৫]

দীনের মুবাল্লিগ, না রাজনৈতিক লিডার?

যে কষ্টিপাথর মির্যা সাহেব আমাদের দিয়েছেন এবং যা মেযাজে নবুওয়তের হুবহু অনুরূপ, সে কষ্টিপাথর দ্বারা মির্যা সাহেবের জীবনী অধ্যয়ন করলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় : যখন তাঁর আন্দোলন ছড়িয়ে গেলো এবং তিনি একটি বড় ফের্কার আধ্যাত্মিক নেতায় পরিণত হয়ে গেলেন, তখন তাঁর প্রাথমিক জীবন এবং পরবর্তী জীবনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য হয়ে গেছে। বর্তমান অবস্থায় এসে তাঁকে দীনের মুবাল্লিগ ও নববী শিক্ষায়তনের ফয়েযপ্রাপ্ত একজন খাঁটি ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে রাজনৈতিক লিডার ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাদের অনুরূপ বলে মনে হয়। তাঁর শেষ জীবনে (যা পরকালের সফর ও আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়) ভোগ-বিলাস ও আরাম আয়েশের সে দৃশ্য সম্মুখে আসে, যা রাজনৈতিক নেতাদের জীবনে দেখতে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টি তাঁর নিকটতম সাথীদেরও সন্দেহের কারণ হয়ে পড়ে আর মনের কথা মুখে আসতে শুরু করে।

মির্যা সাহেবের ঘরোয়া যিন্দেগী

মির্যা সাহেবের ঘরোয়া যিন্দেগী যত শোভা-সৌন্দর্য ও বিলাসিতার ছিল তা একজন খাঁটি অনুসারীর জন্যও প্রশ্ন এবং সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাজা কামালুদ্দীন সাহেব একদিন নিজের বিশেষ বন্ধুদের সামনে এ কথার

---

৫. বারাহীনে আহমদিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ-১১৭

আলোচনা করেছেন যে, তাঁর বাড়ির যে সব মহিলা মির্যা সাহেবের বাড়ির চাল-চলন ও জীবন যাপন প্রণালী দেখেছে, তারা কিছুতেই নিজেদের প্রয়োজন না মিটিয়ে, অল্পে তুষ্ট থেকে আন্দোলনের প্রচার প্রসারের জন্য অর্থ পাঠাতে প্রস্তুত নয়। একবার তিনি মৌলবী মুহাম্মদ আলী (আমীর, জামাতে আহমদিয়া, লাহোর) এবং কাদিয়ানী জামাতের বিখ্যাত আলেম মৌলবী সারওয়ার শাহ কাদিয়ানীর কাছে বলেছেন–

'আমার একটি প্রশ্ন রয়েছে, যার উত্তর আমার কাছে নেই। এটি আমি পেশ করছি, আপনারা এর জবাব দেবেন। প্রথমে আমি আপন ঘরের মহিলাদের এ কথা বলি, আম্বিয়া ও সাহাবাদের জীবন অনুসরণ করা উচিত– তাঁরা কম ও শুকনো খাবার খান এবং মোটা কাপড় পরিধান করেন, আর বাকীগুলো বাঁচিয়ে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন, আমাদেরও তেমনি করা উচিত। সারকথা, এ ধরনের ওয়াজ করে কিছু পয়সা বাঁচাতাম এবং কাদিয়ানে পাঠাতে থাকতাম, কিন্তু যখন আমাদের বিবিগণ নিজেরা কাদিয়ানে গেলেন এবং সেখানে অবস্থান করে ভালভাবে সেখানকার অবস্থা জেনে নিলেন, ফিরে এসে তখন আমার উপর রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগলেন, তুমি তো বড়ই মিথ্যাবাদী! আমরা কাদিয়ানে গিয়ে আম্বিয়া ও সাহাবাদের জীবনাচার দেখে এসেছি। সেখানকার মহিলাদের যে পরিমাণ বিলাসিতা রয়েছে, বাইরে কারো এর এক দশমাংশও নেই। অথচ আমাদের অর্থ নিজেদের অর্জিত। আর তাদের কাছে যে অর্থ পৌঁছে, তা দশের স্বার্থে পাঠানো, দশ জনের। সুতরাং তুমি মিথ্যাবাদী। যে মিথ্যা কথা বলে এ সুদীর্ঘ সময় আমাদের ধোকা দিয়ে আসছো, ভবিষ্যতে আর কখনো আমরা তোমার সে ধোকায় পড়ব না। তাই তারা কাদিয়ানে পাঠানোর জন্য আমাকে অর্থ দিচ্ছে না।

খাজা সাহেব এ-ও বলেছেন :

'একটি উত্তর তোমরা মানুষকে দিয়ে থাকো, তোমাদের সে উত্তর আমার সামনে দেওয়া চলে না। কেননা, আমি নিজেই সে সম্বন্ধে অবহিত আছি।'[৬] অতঃপর কতিপয় অলংকার ও কিছু কাপড় ক্রয় করার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

---

৬. কাশফুল ইখতিলাফ : সারওয়ার শাহ কাদিয়ানী, পৃ-১৩

অর্থের অভিযোগ

ধারণা করা যায়, মির্যা সাহেবের সময়ে, তাঁর তত্ত্বাবধানে সাধারণের জন্য যে ভোজনালয়ের ব্যবস্থা ছিল, তাতে অনেক ভক্ত অনুরক্তরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাদের মতে এখানে অনেক আপত্তিকর কাজ হতো। এ বিষয়টি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। অভিযোগকারীদের মধ্যে খাজা কামালুদ্দীন ছিলেন সবার অগ্রে। মৌলবী মুহম্মদ আলী সাহেবও তাঁর সমর্থক ছিলেন। খাজা কামালুদ্দীন এক স্থানে মৌলবী মুহম্মদ আলী সাহেবকে বলেছেন :

'এটা কত রাগের কথা, আপনি জানেন : সাধারণের অর্থ কত কষ্টে জমা করা হয়। আর যে জাতীয় স্বার্থে তারা নিজেরা অভুক্ত থেকে অর্থ দান করে, সে অর্থ জাতীয় স্বার্থে ব্যয় হয় না; বরং ব্যয় হয় ব্যক্তি স্বার্থে। সে পয়সার অংকও এত অধিক যে, এখন যে পরিমাণ সমাজকল্যাণমূলক কাজ আপনি শুরু করেছেন, যা অর্থের স্বল্পতার কারণে পূর্ণ হচ্ছে না এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে, যদি এ মেহমানখানার অর্থ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা হতো, তবে শুধু এ অর্থ দ্বারাই সকল কাজ সমাধা হয়ে যেতে পারত।'[৭]

এসব আপত্তি মির্যা সাহেবের কানেও পৌঁছে। এতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। মৌলবী ছারওয়ার শাহ লিখেছেন :

'বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছেন : আমার বলা সত্ত্বেও আল্লাহর ইচ্ছা এ-ই যে, আমার জীবদ্দশায় মেহমানখানার দায়িত্ব আমার হাতেই থাকবে, আর এর বিপরীত হলে সেটি বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এই খাজা প্রমুখরা এমন যে, বার বার আমাকে বলে, মেহমানখানার দায়িত্ব আমাদের দিয়ে দাও, আর তারা আমাকে সন্দেহ করে।'[৮]

খোদ মির্যা সাহেবও মৃত্যুর কিছু পূর্বে এ অর্থের অভিযোগের আলোচনা এবং নিজের দুঃখের কথা প্রকাশ করেছেন। মির্যা বশীরুদ্দীন মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের নামে প্রেরিত এক চিঠিতে লিখেছেন :

---

৭. কাশফুল ইখতিলাফ : পৃ-১৫

৮. প্রাগুক্ত, পৃ-১৪

'হযরত সাহেব তাঁর মৃত্যুর পূর্বে- যে দিন তাঁর ওফাত হয়েছে সে দিন অসুখের অল্পক্ষণ আগে বলেছেন, খাজা (কামালুদ্দীন) সাহেব ও মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব প্রমুখ আমার উপর সন্দেহ করেন; আমি সাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করি। তাঁদের এরূপ করা উচিত হয়নি; কেননা তাতে পরিণাম ভাল হবে না। যেমন, তিনি বলেছেন, আজ খাজা সাহেব মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবের একটি চিঠি নিয়ে এসেছেন এবং বলেছেন, মৌলবী মুহাম্মদ আলী লিখেছেন, মেহমানখানায় খরচ তো হয় সামান্য, বাকি যে হাজার হাজার টাকা আসে তা কোথায় যায়? ঘরে এসে তিনি খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন : এরা আমাকে হারামখোর মনে করে। এ অর্থের সাথে তাদের সম্পর্ক কি? আজ যদি আমি পৃথক হয়ে যাই, তবে সকল আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে।

অতঃপর খাজা সাহেব একটি ডিপুটেশনে মাদ্রাসার ইমারতের চাঁদার জন্য গেলে মৌলবী মুহাম্মদ আলীর কাছে বলেন : হযরত (মির্যা) সাহেব তো খুব আরাম আয়েশে জীবন অতিবাহিত করেন, আর আমাদের এ তা'লীম দেন, নিজেদের খরচ কমিয়ে হলেও চাঁদা দাও। যার উত্তর মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব এভাবে দিয়েছেন, হ্যাঁ, এ তো অস্বীকার করা যায় না, তবে এ-ই মানুষের স্বভাব। কি প্রয়োজন আছে, আমরা নবীর মানবীয় গুণাবলীর অনুসরণ করব?'[৯]

আয়ের নতুন নতুন উৎস

মির্যা সাহেবের জীবদ্দশাতেই কাদিয়ানের 'বেহেশতী কবরস্তানে' এ জায়গা পাওয়ার জন্য যে শর্তাবলী তৈরি করা হয়েছিল এবং এক একটি কবরের জায়গার জন্য যে পরিমাণ অধিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং এর প্রতি লোকদের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার জন্য যে ব্যাপক প্রচারণা

---

৯. প্রথম খলীফা হাকীম নুরুদ্দীন সাহেবের নামে লিখিত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমূদ সাহেবের চিঠি। দ্রষ্টব্য : হাকীকাতুল ইখতিলাফ : মৌলবী মুহাম্মদ আলী, আমীর, জামায়াতে আহমদিয়া, লাহোর, পৃষ্ঠা-৫০

আর্থিক অভিযোগের ক্ষেত্রে আমি শুধু বিশেষ বিশেষ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের বর্ণনার উপর যথেষ্ট করেছি। অন্যথায় ডাঃ আবদুল হাকীম সাহেবের গ্রন্থ 'আযযেকরুল হাকীম' ইত্যাদিতে এ বিষয়ে বহু তথ্য রয়েছে।

চালানো হয়েছিল,[১০] তা মধ্যযুগের গির্জাবাসীদের 'ক্ষমার সদন' ক্রয় বিক্রয় ও জান্নাতের কাওয়ালা বিক্রয় করার কথা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর কাদিয়ান কেন্দ্রের জন্য তাতে আয়ের একটি প্রশস্ত দরজা খুলে যায়। কিছুদিন পর কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের জন্য তা একটি বড় ধরনের ইনষ্টিটিউশনে পরিণত হয়ে যায়। কাদিয়ানের মুখপত্র 'আল-ফযল' এক সংখ্যায় যথার্থই লিখেছে :

"বেহেশতী কবরস্তান' এই সিলসিলার এমন একটি কেন্দ্রীয় ধারণা এবং এমন একটি ইনষ্টিটিউশন, যার গুরুত্ব অন্য সব ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক বেশী।"[১১]

কাদিয়ান এবং রাবওয়া'র দীনী জমিদারী

এর পরিণাম এই হলো, কাদিয়ানী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল কাদিয়ান এবং ভারত বিভক্তির পর 'রাবওয়া' একটি গুরুত্বপূর্ণ দীনী জমিদারীতে পরিণত হয়ে গেল। যাতে কাদিয়ানের 'নবী বংশ' এবং এর প্রধান মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ সাহেবের জন্য ঐ সব প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী এবং বিলাসিতা ও আয়েশী জীবন যাপনের জন্য এমন সব সুযোগ সুবিধা তৈরী রাখা হয়েছে, যা এ সময়ে কোন বড় খ্যাত নামা ব্যক্তিত্বের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়। এই দীনী ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের' আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং এর আমীরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হাসান বিন সাব্বাহ বাতেনীর 'মৃত্যু কিল্লা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যা হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে ধর্মীয় শক্তি ও আরাম আয়েশের একটি রহস্যপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।[১২]

---

১০. বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, মির্যা সাহেবের রেসালা আল্-অসিয়্যত, পৃ-১১-২৩

১১. 'আল-ফযল', কাদিয়ান, বর্ষ-২৪, সংখ্যা-৬৫, তাং-১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

১২. দ্রষ্টব্য : রাহাত মালিক সাহেব লিখিত 'দাওরে হাযের কা মাযহাবী আমের'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইংরেজদের সহযোগিতা প্রদান ও জিহাদ নিষিদ্ধ ঘোষণা

গ্রেট বৃটেন ও আলমে ইসলাম

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই আলমে ইসলামের উপর ইউরোপের আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপ ইসলামী দুনিয়াকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছিল। প্রাচ্যকে গ্রাস করার ব্যাপারে ইউরোপের বৃটেন ছিল সকলের অগ্রে এবং প্রাচ্যে পাশ্চাত্যের সভ্যতা সংস্কৃতি আমদানীর ব্যাপারে সে-ই ছিল নিশানবরদার। ভারতবর্ষ ও মিসর ছিল তার করায়ত্তে। দৌলতে উছমানিয়া ছিল তার ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যস্থল এবং আরব জাহান ছিল তার ক্ষমতার লোভের সামনে সর্বদা বিপন্ন।

ভারতবর্ষে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই কার্যত ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। শাহ জাহান ও আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীরা হয়ে গিয়েছিল ইংরেজদের বেতনভোগী কর্মচারী ও রাজনৈতিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত। দেশের রাজনীতির মূল চাবিকাঠি ঘুরাত ইংরেজরা এবং ওরাই ছিল সব কিছুর নিয়ন্তা। ১৭৯৯ সনে হিন্দুস্তানের মর্দে মুজাহিদ টিপু সুলতান লড়াইয়ের ময়দানে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন। এতে ইংরেজদের জন্য দেশের রাজনীতির আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেল। সালতানাতের শক্তির উপর নির্ভর করে পাদ্রীরা প্রকাশ্যে খ্রিষ্টবাদের প্রচার শুরু করল।

স্বাভাবিকভাবে এ প্রচারণার লক্ষ্যস্থল ছিল মুসলমানরা; সরাসরি যাদের কাছ থেকে দেশ ছিনিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইসলামের শিক্ষা ও মূলনীতি নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করা হতে লাগল। দেশে সব ব্যাপারে একটা বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গেল। ইসলামের সামাজিক জীবনের ভিত্তিগুলো নড়বড়ে হয়ে গেল। পশ্চিমা সভ্যতা এসে মুসলমানের মন-মানসে আঘাত হানতে লাগল। শিক্ষিত যুবকদের মাঝে ধর্মদ্রোহিতা একটা ফ্যাশনে পরিণত হতে শুরু করল।

এ সবের প্রতিরোধকল্পে ১৮৫৭ সনের বিপ্লব হল। এ বিপ্লবের নেতৃত্ব ছিল মুসলমানের হাতে, কিন্তু বিপ্লবে ইংরেজদের বিজয় হল। এ দেশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন থেকে সরাসরি চলে গেল ইংল্যান্ড সরকারের হাতে। আঘাতপ্রাপ্ত বিজয়ীরা বিপ্লবের মূল হোতা 'বিদ্রোহী মুসলমানদের' উপর পুরোপুরি প্রতিশোধ নিল। ওরা মুসলমানদের অপমান করল। আলেম ওলামা, সূফী দরবেশ ও সম্মানী লোকদের ফাঁসি কাষ্ঠে চড়াল। ইসলামী ওয়াকফ সম্পত্তি গ্রাস করে নেওয়া হল। ভাল ভাল চাকরির দরজা মুসলমানের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। দেশের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থেকে তাদের উৎখাত করা হল।[১] মুসলমানরা একটি পরাজিত জাতির লাঞ্ছিত সদস্যে পরিণত হল। তখন এ দেশে কুরআনী রহস্যের বাস্তব নমুনা পরিলক্ষিত হতে লাগল :

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً (النمل -٣٤)

রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্থ করে। –(নামল : ৩৪)

ইংরেজরা এ দেশে শুধু অত্যাচারী শাসক-ই ছিল না, সেই সাথে ছিল ওরা এমন এক সংস্কৃতির ধ্বজাধারী, যা এ দেশে সন্ত্রাস, নাস্তিকতা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেওয়ার উৎস হিসেবে কাজ করত। ইংরেজরা ছিল একটি অন্যায়কারী সম্প্রদায়। যাদের ইতিহাস ইসলামী জগতের উপর অত্যাচার ও রাজনৈতিক শোষণে রঞ্জিত।

আম্বিয়া ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কর্মপদ্ধতি

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং তাঁদের উত্তরাধিকারী অনুসারীদের যে ইতিহাস ও জীবনালেখ্য দুনিয়ায় সংরক্ষিত আছে, তাতে স্পষ্ট জানা যায়, সর্বদা তাঁরা অত্যাচারী ও অন্যায়কারীদের বিরোধী প্রতিরোধকারী ছিলেন। তাঁরা সব

---

১. বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, ডঃ স্যার উলিয়াম হান্টারের গ্রন্থ Our Indian MussalMans এবং স্যার সৈয়দের 'আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ'।

সময় এ ধরনের ব্যাপার থেকে দূরে থাকতেন, যাতে তাঁদের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত মূসা (আ.)-এর নিম্নোক্ত বাণী কুরআন শরীফে বর্ণিত রয়েছে :

رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ (سورة قصص - ١٧)

'হে আমার প্রতিপালক, তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।' কাসাস : ১৭

কুফর ও যুলম এবং তার পতাকাধারীদের বিরুদ্ধে তাঁর অন্তরে যে পরিমাণ রাগ ও ক্ষোভ বিদ্যমান ছিল, এর প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সেই প্রসিদ্ধ দোয়ায়, যা তিনি করেছিলেন সমকালীন ফেরআউন ও তার রাজত্বের নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে–

رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ (يونس-٨٨)

'হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি ফের'আউন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছ যদ্ধারা, হে আমাদের প্রতিপালক! ওরা মানুষকে তোমার পথ থেকে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদের প্রতিপালক! ওদের সম্পদ বিনষ্ট কর, ওদের হৃদয় মোহর করে দাও, ওরা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করিবে না।'– (ইউনুস : ৮৮)

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলেছেন-

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ (هود-١١٣)

'যারা সীমালংঘন করেছে তাহাদের প্রতি ঝুঁকে পড়া না; পড়লে অগ্নি তোমাদেকে স্পর্শ করবে। এ অবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন

অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্য করা হবে না।' (হুদ : ১১৩)

হাদীস শরীফে আছে :

اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

'উত্তম জিহাদ হলো, জালেম বাদশাহর সামনে সত্য কথা বলা।'

রাসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের যোগ্য উত্তরসুরীগণ কখনো কোন জালেম সরকার ও অশুভ শক্তির সহযোগিতা করেননি। তাঁদের মুখে কখনো এদের প্রশংসা ও সহযোগিতার কথা আসেনি। সমসাময়িক বাদশাদের সামনে সত্য কথা বলার ঘটনাবলী ও অত্যাচারীদের মুকাবিলায় জিহাদের পতাকা উড্ডীন করার সুকীর্তিতে ইসলামী রেনেসাঁর মহান অগ্রপথিকদের ইতিহাস পূর্ণ। ইসলামের ইতিহাসের সামান্যতম সময় এবং ক্ষুদ্রতম এলাকাও এ উত্তম জিহাদ শূন্য নয়।

ইংরেজ সরকারের সহযোগিতা ও জিহাদ নিষিদ্ধ ঘোষণা

কিন্তু কুরআন শরীফের এ সুস্পষ্ট শিক্ষা ও রূহে ইসলামের সম্পূর্ণ উল্টো এবং নবী রসূল, সাহাবা, তাবেঈন ও তাদের অনুসারীদের উত্তম আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে- যিনি আল্লাহর নির্দেশিত ও আল্লাহর রসূল হওয়ার দাবী করেন- দেখা যায় সমসাময়িক যুগের শক্তিধর তাগুব ইংরেজদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁকে এ শাসনের অত্যন্ত উৎসাহী সহযোগী হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। যে সরকার ছিল ইসলামী শাসনের প্রধান শত্রু ও সে দিনের দাঙ্গা, সন্ত্রাস এবং নাস্তিকতার পতাকাবাহী, মির্যাকে খোলাখুলিভাবে সে সরকারের প্রশংসা করতে দেখা যায়, একজন বোধসম্পন্ন মানুষ যার জন্য কখনো প্রস্তুত থাকতে পারে না। প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে তাঁর এত গুরুত্ব ছিল যে, তাঁর কোনো রচনাই এ থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তাঁর প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'বারাহীনে আহমদিয়া'র প্রথম খণ্ডে যেভাবে এ হুকুমতের প্রশংসা করেছেন, এর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা গণনা করে দেখিয়েছেন এবং যেভাবে ইসলামী সংগঠনগুলোকে মুসলমানের পক্ষ থেকে

আনুগত্যের স্বীকৃতি পেশ করার ও জিহাদ রহিত করার পরামর্শ দিয়েছেন, পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে এর কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্তও এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। এ বিষয়ের উপর তিনি বিস্তৃত এক লাইব্রেরী তৈরী করে ফেলেছেন। যাতে তিনি বারংবার স্বীয় আনুগত্য, একনিষ্ঠতা, নিজের বংশগত খেদমত ও ইংরেজ সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় নিমগ্ন থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। যে মুহূর্তে মুসলমানের মাঝে দীনী চেতনা জাগরিত করার অতীব প্রয়োজন ছিল, সে সময়ে বার বার তিনি জিহাদ নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন। এখানে খুবই সংক্ষেপে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল। এক স্থানে তিনি লিখেছেন :

'আমার বয়সের অধিকাংশ সময়ই এ ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায় অতিবাহিত হয়েছে। আর আমি জিহাদ নিষিদ্ধ করা ও ইংরেজদের আনুগত্য করার ব্যাপারে এতো বেশী গ্রন্থ প্রণয়ন করেছি, যদি তা একত্রিত করা হয় তবে পঞ্চাশটি আলমারি ভরে যাবে। আমি এ ধরনের গ্রন্থগুলো আরব জাহান, মিসর, সিরিয়া, কাবুল ও রোম পর্যন্ত পৌছে দিয়েছি। সর্বদাই আমার এ প্রচেষ্টা ছিলো যে মুসলমানরা এ সরকারের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হয়। আর খুনী মাহেদী, খুনী মসীহ– এ ধরনের ভিত্তিহীন বর্ণনাগুলো এবং জিহাদের স্পৃহা জাগ্রত করার মাসায়েল যা আহমকদের অন্তর কলুষিত করে রেখেছে, তা যেন তাদের মন থেকে মুছে যায়।'[২]

স্বীয় গ্রন্থ 'শাহাদাতুল কুরআন'-এর শেষে লিখেছেন :

'আমার মাযহাব, –যা আমি বার বার প্রকাশ করছি, ইসলামের দুটো অংশ; এক. আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা, দুই. এ সরকারের- যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, যে জালেমদের হাত থেকে নিজের ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছে, তা হচ্ছে বৃটিশ সরকারের রাজত্ব।'[৩]

পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে ১৮৯৮ সনের ২৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে যে দরখাস্ত তিনি পেশ করেছিলেন, তাতে লিখেছেন :

---

২. তিরয়াকুল কুলুব, পৃ-১৫

৩. ইশতেহার, পৃ-৩, 'শাহাদাতুল কুরআনে'র সবশেষে সংযুক্ত।

'দ্বিতীয় আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আমি জীবনের শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত, যখন আমার বয়স ষাট বছরে পৌছেছে, নিজের মুখ ও কলম দ্বারা এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত রয়েছি, যাতে মুসলমানের অন্তরকে ইংরেজ সরকারের প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা ও সহমর্মিতার দিকে ফিরিয়ে নিতে পারি। আর তাদের কতিপয় অল্প শিক্ষিতের অন্তর থেকে যাতে জিহাদ ইত্যাদির ন্যায় ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দিতে পারি, যা অন্তরের নিষ্কলুষতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আর আমি দেখছি, মুসলমানের অন্তরে আমার লেখার বেশ প্রতিক্রিয়া হয়েছে, লাখো মানুষের মাঝে আজ পরিবর্তন এসে গেছে।'[৪]

অপর এক স্থানে তিনি লিখেছেন :

'আরবী, ফারসী ও উর্দূতে প্রায় বিশটি গ্রন্থ আমি এ উদ্দেশে লিখেছি যে, এ উপকারী সরকারের সাথে ঘুণাক্ষরেও জিহাদ করা বৈধ নয়; বরং নিষ্ঠার সাথে সরকারের আনুগত্য করা সকল মুসলমানের জন্য ফরয। যেমন, আমি এ গ্রন্থগুলো অনেক অর্থ ব্যয় করে ছেপে ইসলামী দুনিয়ায় পৌছে দিয়েছি।

আমি জানি, এ গ্রন্থগুলোর প্রভাব এ দেশেও পড়েছে। আর যারা আমার সাথে মুরীদীর সম্পর্ক রাখে, তাদের এমন একটি দল সৃষ্টি হচ্ছে, যাদের অন্তর সরকারের হিত কামনায় পূর্ণ। তাদের চারিত্রিক অবস্থা অনেক উন্নত। আর আমার ধারণা, এরা সবাই এ দেশের জন্য বরকতের বিষয় এবং গভর্নমেন্টের জন্য আত্মোউৎসর্গকারী।'[৫]

তিনি অপর এক জায়গায় লিখেছেন :

'আমার দ্বারা ইংরেজ সরকারের যে খেদমত হয়েছে, তা হলো, আমি পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি গ্রন্থ, পুস্তিকা এবং ইশতেহার ছাপিয়ে এ দেশ ও অপরাপর মুসলিম দেশে এ তথ্যসহ প্রচার করেছি যে, ইংরেজ গভর্ণমেন্ট আমাদের মুসলমানের সাহায্যকারী। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয হলো এই গভর্ণমেন্টের যথার্থ আনুগত্য করা এবং এ সরকারের কৃতজ্ঞতা

---

৪. তাবলীগে রেসালাত, খ-৭, পৃ-১০

৫. মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পক্ষ থেকে ইংরেজ গভর্নমেন্টের খেদমতে পেশকৃত দরখাস্ত; দ্রষ্টব্য : 'তাবলীগে রেসালাত, খ-৬, পৃ-৬৫, রচয়িতা : মীর কাসেম আলী কাদিয়ানী।

আদায়কারী ও কল্যাণকামী হওয়া। আর এ গ্রন্থগুলো আমি বিভিন্ন ভাষায়, যেমন উর্দূ ফারসী ও আরবীতে রচনা করে ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছি। ইসলামের দুইটি পবিত্র শহর মক্কা মদীনায়ও ভালোভাবে প্রচার করেছি রোমের রাজধানী কনস্টান্টিনোপাল, সিরিয়া, মিসর এবং কাবুলসহ আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরে যতদূর সম্ভব প্রচার করা হয়েছে। যার ফল এ দাঁড়িয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ জিহাদের সেই কুৎসিত ধারণা পরিত্যাগ করেছে, যা মূর্খ মোল্লাদের কারণে তাদের মাঝে এসেছিল। আমার দ্বারা এটি এমন এক খেদমত হয়েছে যে, আমার আজ গর্ববোধ হয়, বৃটিশ ভারতের সকল মুসলমানের মাঝে কেউ এর তুলনা দেখাতে পারেনি।'[৬]

মির্যা সাহেবের বিশেষ দৃষ্টি ছিল জিহাদের বিধানের উপর; যা ইংরেজ সরকারের জন্য শুধু ভারতবর্ষেই নয়; বরং সকল ইসলামী দুনিয়ায় (যার বৃহৎ অংশ বৃটিশের করায়ত্তে চলে এসেছিল) বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল। মির্যা সাহেব জিহাদ স্থায়ীভাবে রহিত ও নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এবং একে নিজের মসীহ মওউদ হওয়ার অন্যতম নিদর্শন বলে অভিহিত করেছেন। 'মিনারাতুল মসীহ'-এ চাঁদার ঘোষণায় তিনি বলেছেন :

'তৃতীয় ঐ ঘন্টা, যা এ মিনারের দেওয়ালের কোনো অংশে লাগিয়ে দেওয়া হবে, এর মধ্যে এ রহস্য লুক্কায়িত যে, মানুষ যাতে নিজের সময়কে চিনতে পারে যে, আসমানের দরোজা খুলে যাওয়ার সময় এসে গেছে। এখন থেকে যমীনের জিহাদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং ঝগড়ার সমাপ্তি ঘটেছে। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে, যখন মসীহ আসবে, তখন থেকে দীনের উদ্দেশে লড়াই করা হারাম করে দেওয়া হবে; সুতরাং এখন থেকে দীনের জন্য লড়াই করা হারাম করে দেওয়া হলো। এখন থেকে যে ব্যক্তি দীনের উদ্দেশে তরবারি উত্তোলন করে এবং গাজী নাম রেখে কাফেরদের হত্যা করে, সে খোদা ও তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্যকারী। সহীহ বুখারী খুলে দেখো এবং ঐ হাদীসটি পাঠ করো, যা মসীহ মওউদের ব্যাপারে রয়েছে। অর্থাৎ يضع الحرب যার অর্থ, যখন মসীহ আসবে তখন জিহাদী লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘটবে। সুতরাং মসীহ এসে গেছে, আর ইনিই মসীহ, যিনি তোমাদের সাথে কথা বলছেন।'[৭]

---

৬. সিতারায়ে কায়সারাহ, পৃ-৩

৭. 'মিনারাতুল মসীহ'-এর চাঁদার ইশতেহার।

জিহাদের বিধান মওকূফ করা তিনি তাঁর প্রেরিত হওয়ার বড় উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। 'তিরয়াকুল কুলুবের' পরিশিষ্ট 'ইশতেহার ওয়াজিবুল ইজহার'-এ লিখেছেন :

'সার কথা, আমি এ জন্য প্রেরিত হইনি যে, লড়াই ও সংঘর্ষের ময়দান চাঙ্গা করব; বরং এ জন্য প্রেরিত হয়েছি, প্রথম মসীহের ন্যায় আপোষ মীমাংসার দরোজা খুলে দেব। মীসাংসার ভিত্তি যদি মাঝে না থাকে তবে আমাদের পুরো সিলসিলাই অর্থহীন এবং এর উপর ঈমান আনাও অর্থহীন।'[৮]

এক স্থানে আরো স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে লিখেছেন :

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যেভাবে আমার মুরীদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে, সেভাবে জিহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীর সংখ্যাও কমতে থাকবে। কেননা, আমাকে 'মসীহ' ও 'মাহদী' মেনে নেওয়াই জিহাদ অস্বীকার করা।'[৯]

ইংরেজদের জন্য কিল্লা ও তাবিয

মির্যা সাহেব স্বীয় আরবী পুস্তিকা 'নূরুল হকে' স্পষ্টভাবে এতদূর পর্যন্ত লিখে দিয়েছেন, তাঁর অস্তিত্ব ইংরেজ শাসনের জন্য একটি দুর্ভেদ্য কিল্লা এবং তাবিয সদৃশ। তিনি নিজের খেদমতগুলো গণনা করে লিখেছেন :

فلى ان ادعى التفرد فى هذه الخدمات ولى ان اقول اننى وحيد فى هذه التائيدات ولى ان اقول انى حرزلها وحصن حافظ من الافات وبشرنى ربى وقال ماكان الله ليعذبهم وانت فيهم فليس للدولة نظيرى ومثيلى فى نصرى وعونى وستعلم الدولة ان كانت من المتوسمتن-[১০]

---

৮. তিরয়াকুল কুলুব, পৃ-৩৩৫,

৯. তাবলীগে রেসালাত, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৭

১০. নূরুল হক, পৃ-৩৪

'আমার অধিকার আছে, আমি এ দাবী করব যে, আমি এ খেদমতে অদ্বিতীয়। আর আমার অধিকার আছে, আমি এ কথা বলব, আমি এ হুকুমতের জন্য তাবিয এবং এ ধরনের কিল্লা, যা হুকুমতকে মসিবত ও দুর্দশা থেকে সংরক্ষণকারী। আমার প্রভু আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন : আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না, যতক্ষণ তুমি তাদের মাঝে থাকবে। সুতরাং এ হুকুমতের সাহায্য সহযোগিতায় আমার আর কোনো তুলনা নেই। আল্লাহ যদি এ হুকুমতকে মানুষ চেনার দৃষ্টিশক্তি দান করে থাকেন তবে তা স্বীকার করবে।'

নিজের লাগানো চারা

মির্যা সাহেব ১৮৯৮ সনের ২৪ ফেব্রুয়ারী পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে যে দরখাস্ত পেশ করেছিলেন তাতে লিখেছেন :

"একটা সবিনয় নিবেদন করা হচ্ছে, সরকার বাহাদুর ঐ বংশের ব্যাপারে, যা পঞ্চাশ বছরের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একটি অনুগত ও আত্মোউৎসর্গকারী বংশ বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং যার ব্যাপারে সরকার বাহাদুরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ সর্বদা নিজেদের রোজনামচায় বলিষ্ঠভাবে এ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, এ বংশ অনেক দিন থেকেই ইংরেজ সরকারের খেদমতগার ও কল্যাণকামী; সুতরাং নিজের লাগানো এই চারার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা, যাচাই বাছাই ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আর অধীনস্থ কর্মচারীদের নির্দেশ দেবেন, তারাও যেন এ বংশের আনুগত্য ও একনিষ্ঠতার কথা খেয়াল রেখে আমাকে ও আমার জামায়াতকে মেহেরবানীর দৃষ্টিতে দেখেন।"[১১] কোনো কোনো দরখাস্তে নিজের ও নিজের জামায়াতের জন্য 'ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহে পালিত এবং সুনাম অর্জনকারী'– এরকম শব্দও প্রয়োগ করা হয়েছে।

---

১১. তাবলীগে রেসালাত, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৯

পাদ্রীদের সাথে বিতর্ক সভা করার প্রতি অত্যধিক উৎসাহের কারণ

মির্যা সাহেবের ইংরেজ সরকারের সাথে এতটুকু একনিষ্ঠতা এবং সরকারের কল্যাণ কামনার প্রতি এত উৎসাহ ছিল যে, মুসলমানের ঘৃণার ভাব লঘু করার জন্য তিনি বহু চেষ্টা তদবীর করেছো। খ্রিষ্টান ও পাদ্রীদের বিরদ্ধে যে আবেগ স্পৃহার প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছেন, এর কারণস্বরূপ তিনি বর্ণনা করেছেন, ঐ ঈসায়ী পাদ্রীরা ইসলামের বিরুদ্ধতা ও ইসলামের পয়গম্বরকে অপমান করার এমন পন্থা অবলম্বন করেছিল, যাতে মুসলমানের মাঝে ধর্মীয় জোশ ও প্রতিশোধস্পৃহা সৃষ্টি হয়ে যেতো এবং সরকারের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা ছিল, এ জন্য আমি ইচ্ছাকৃতভাবে পাদ্রীদের বিরোধিতা করার ব্যাপারে এতো আবেগ প্রকাশ করেছি। যেন মুসলমানের অন্তরবেদনা ঠাণ্ডা ও নিস্প্রভ হয়ে যায়। তিনি লিখেছেন :

'আমি এ কথাও স্বীকার করছি, যখন কতিপয় পাদ্রী ও খ্রিষ্টান মিশনারীর রচনা অত্যন্ত কঠোর হয়ে পড়ল এবং সীমা অতিক্রম করে গেল, বিশেষ করে লুধিয়ানা থেকে প্রকাশিত 'নূরে আফশাঁ' নামক একটি ঈসায়ী পত্রিকায় যখন অতিশয় বিশ্রী রকম রচনা ছাপা হলো এবং ঐ লেখকগণ আমাদের নবী (সা.)-এর ব্যাপারে, নাউযুবিল্লাহ, অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করতে লাগল, তখন এ রকম গ্রন্থ ও পত্রিকা পড়ে আমার আশংকা হলো, মুসলমানদের অন্তরে- যারা একটি আবেগপ্রবণ জাতি- এ কথাগুলো কঠোর কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, তখন আমি এ আবেগ শান্ত করার জন্য নির্মল অন্তরে এটাই ভাল মনে করলাম যে, এ সাধারণ জোশ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কঠোরভাবে এ রচনাগুলোর জবাব দেওয়া হোক। তা হলে আবেগপ্রবণ মানুষের আবেগ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এবং দেশে কোনো বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে না।'[১২]

ইংরেজ হুকুমতের স্বেচ্ছাসেবী ও সি.আই.ডি.

এ শিক্ষা, বিশ্বাস এবং প্রচারণার ফল হচ্ছে, ইংরেজ শাসনের আনুগত্য, একনিষ্ঠতা এবং এর খেদমত করার প্রেরণা কাদিয়ানী জামায়াতের অন্তর ও

১২. দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট নং-৩, 'তিরয়াকুল কুলুব' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, পৃ-৩১

চরিত্রের একটি বিশেষ অংশে পরিণত হয়ে গেল। এ জামায়াত থেকে ইংরেজ সরকারের এ ধরনের একনিষ্ঠ খাদেম ও এমন উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবক হাতে এসে গেল, যারা হিন্দুস্তান ও হিন্দুস্তানের বাইরে সরকারের বড় রকম খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে এবং সরকারের জন্য নিজের রক্ত দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। আবদুল লতীফ আফগানিস্তানে কাদিয়ানী মতবাদের এত উৎসাহী প্রচারক ছিল যে, সে প্রকাশ্যে জিহাদের বিরোধিতা করে ফিরত। সে আফগান জাতির সেই জিহাদের স্পৃহা মিটিয়ে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল, যে স্পৃহা কখনো এ দেশে কোনো অমুসলিম বিজয়ী বা শাসকের পা সুদৃঢ় হতে দেয়নি, আর যারা ইংরেজ হুকুমতকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। এ জন্যই আফগান সরকার তাকে হত্যা করে।

মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ সাহেব একজন ইটালিয়ান লেখকের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন :

'সেই ইটালিয়ান লিখক লিখেছেন : সাহেবযাদা আবদুল লতীফ সাহেবকে এ জন্য শহীদ করে ফেলা হয়েছে যে, তিনি জিহাদের বিরুদ্ধে তালীম দিতেন। এতে আফগানিস্তান সরকারের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাতে আফগানীদের স্বাধীনতার স্পৃহা দুর্বল হয়ে যাবে এবং আফগানের উপর ইংরেজদের আধিপত্য ছেয়ে যাবে।'[১৩]

এ খোতবাতেই তিনি এরশাদ করেছেন :

'যদি আমাদের লোক আফগানিস্তানে গিয়ে চুপচাপ থাকতো আর জিহাদের ব্যাপারে আহমদী জামাতের মত ও পথ বর্ণনা না করতো, তবে শরয়ীভাবে তাদের উপর কোনো প্রশ্ন আসতো না, কিন্তু বৃটেন সরকারের ব্যাপারে তাদের যে আবেগ ছিল, সে আবেগের ওরা শিকার হয়ে গেল। এ হামদর্দীর কারণেই তারা শাস্তির যোগ্য হলো, যা কাদিয়ান থেকে নিয়ে গিয়েছিল।'[১৪]

এমনিভাবে মোল্লা আবদুল হালীম ও মোল্লা নূর আলী কাদিয়ানীর কাছে এমন কতিপয় দলীল দস্তাবেয ও চিঠিপত্র পাওয়া গেলো, যা দ্বারা স্পষ্ট

১৩. 'আল-ফযল', তারিখ : ৬ আগষ্ট, ১৯২৫

১৪. প্রাগুক্ত

প্রতীয়মান হয়, তারা আফগান হুকুমতের গাদ্দার, ইংরেজ সরকারের এজেন্ট ও সি.আই.ডি ছিল। আফগানী পত্রিকা 'আমানে আফগান'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে 'আল-ফযল' পত্রিকা এ কথা প্রকাশ করেছে যে, "আফগান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিম্নবর্তী ঘোষণা প্রকাশ করেছে :

কাবুলের দুই ব্যক্তি মোল্লা আবদুল হালীম চাহার আছয়ায়ী ও মোল্লা নূর আলী দোকানদার কাদিয়ানী মতবাদে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছিল এবং লোকদের এ বিশ্বাসের তালীম দিয়ে, সত্য পথ থেকে বিভ্রান্ত করছিল। সাধারণ মানুষ তাদের এ কাজে ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে দিল। এর ফলে অপরাধী প্রমাণিত হয়ে ১১ই রজব বৃহস্পতিবার দিন, সাধারণের হাতে ওরা আদম আবাদ প্রেরিত হলো। তাদের বিরুদ্ধে অনেক দিন থেকে অপর একটি অভিযোগ দায়েরকৃত ছিলো এবং আফগান সরকারের স্বার্থবিরোধী অন্য দেশী মানুষের ষড়যন্ত্রমূলক চিঠিপত্র তাদের কাছে পাওয়া গেছে, যা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তারা আফগানিস্তানের শত্রুদের হাতে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।"[১৫]

১৯২২ সনের ১৯ জানুয়ারী মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ সাহেব প্রিন্স অফ ওয়েলসকে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন, তাতে এ সব ঘটনা গর্বের সাথে উল্লেখ করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন, এ সব ত্যাগ স্বীকার করা হয়েছে ইংরেজ সরকারের সাথে একনিষ্ঠতা ও আনুগত্যের ফলে।[১৬]

ধারণায় ভুল

ইংরেজ সরকারের ক্রমোন্নতি, ক্ষমতার বিস্তার ও সম্প্রসারণ লক্ষ্য করে মির্যা সাহেবের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, হিন্দুস্তানে কখনো ইংরেজ সরকারের পতন আসবে না। তার ধারণায়, সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং সরকারের ভাগ্যের সাথে নিজের ভাগ্যের সংযুক্তি একটা বড় রকম রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও উন্নতমানের বিচক্ষণতার ব্যাপার। সত্য বলতে কি, দীনী গভীরতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা উভয় থেকে যে বঞ্চিত, তার ধারণা ও

---

১৫. 'আল-ফযল', তারিখ : ৩রা মার্চ, ১৯২৫

১৬. A present to his royal highess the Prince of Wales (P.P-7-9)

সিদ্ধান্ত এ ধরনেরই হওয়া স্বাভাবিক। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় এ কথা পুরোপুরি লুক্কায়িত ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছরও অতিবাহিত হতে পারবে না, এ শক্তিশালী ইংরেজ সরকার–যাকে তিনি 'ছায়ায়ে ইলাহ' ও 'দওলতে দীন পানাহ' মনে করতেন, ভারতবর্ষ থেকে এমনভাবে লেজ গুটাবে, যেন মনে হবে তাদের অস্তিত্ব এখানে কখনো ছিল না। আর শুধু ভারতবর্ষেই নয়; বরং সারা দুনিয়ায়-ই তাদের অগ্রগতির সেতারা অস্তমিত হয়ে যাবে।

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব এ ইসলামবিরোধী সরকারের কাছে যেভাবে নিজের অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করেছেন এবং যে আবেগের সাথে গোলামী জীবনকে নেয়ামত মনে করার জন্য মুসলমানদের সবক দিয়েছেন, তার সাথে দূরের সম্পর্কও নেই যে মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বের দাবী তিনি করেছেন।

মরহুম আল্লামা ইকবাল এ হাস্যকর ও বিপরীতধর্মিতার দিকেই ইংগিত করেছেন নিজের নিম্নোক্ত কবিতায় :

شیخ او کرد فرنگی را مرید- گرچہ گوید از مقام بایزید

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের অভদ্রোচিত কথা ও গালিগালাজ

আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাঁদের অনুসারীদের কথাবার্তার ধরন

আম্বিয়া (আ.) ও তাঁদের অনুসারীদের ব্যাপারে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, তাঁরা অত্যন্ত মিষ্টভাষী, ভদ্রোচিত কথার অধিকারী, ধৈর্যশীল, উন্নতমনা, উদার ও শত্রুর সাথে বন্ধুসুলভ ব্যবহারকারী ছিলেন। তাঁরা গালির জবাব দিতেন সালাম দ্বারা, বদ দোয়ার উত্তর দোয়া দ্বারা, অহংকারের উত্তর বিনয় দ্বারা এবং অভদ্রতার জওয়াব দিতেন ভদ্র ব্যবহার দ্বারা। তাঁদের মুখ কখনো গালি-গালাজ বা কোনো অশ্রাব্য কথা দ্বারা কলুষিত হতো না। ভৎর্সনা বিদ্রূপ, তামাশা, ঠাট্টা মস্করা, নিন্দাবাদ, তিরস্কারমূলক কথা ইত্যাদির সাথে তাঁদের আদর্শ চরিত্রের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা যদি কারুর বিরোধিতা করতেন, তবে সরলতাপূর্ণ স্পষ্ট বাক্য দ্বারা করতেন। কারুর বংশের উপর আক্রমণ করা, কারুর বাপ দাদার উপর কলংক লেপন করা এবং চাটুকারদের ন্যায় অযথা হাস্যকর ও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাক্য তৈরী করা ইত্যাদি বিষয়ের সাথে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁদের কথা (সহযোগিতা বিরোধিতা উভয় স্থলে) তাঁদের চরিত্র ও স্বভাবের ন্যায় পবিত্র, সংযত সমপরিমিত ও সুস্পষ্ট ছিল। সাহাবায়ে কেরাম হুযুর (সা.)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন :

مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَّلَا صَخَّابًا فِى الْاَسْوَاقِ (ترمذى)

রসূলুল্লাহ (স.) কঠোর ভাষা ব্যবহারকারী ছিলেন না, লৌকিকভাবে কঠোর ভাষা ব্যবহারকারী হয়েও যেতেন না এবং বাজারে গিয়ে গাম্ভীর্য নষ্ট করে এমন কথাও বলতেন না।

খোদ রাসূলুল্লাহ (সা.) মু'মিনের পরিচয় দিতে গিয়ে এরশাদ করেছেন :

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ

(ترمذى)

মু'মিন কাউকে ভৎর্সনা করে না, কাউকে লা'নত করে না, কঠোর কথা বলে না এবং কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করে না।

এর বিপরীত মহানবী (সা.) মুনাফিকের একটি বৈশিষ্ট্য এ-ও বর্ণনা করেছেন–

وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (بخارى ومسلم)

কারুর সাথে যখন তার ঝগড়া হয়, অমনিই গালিগালাজ শুরু করে দেয়।

হযরত আম্বিয়া (আ.) বিশেষ করে সাইয়েদুল আম্বিয়া (আ.)-এর মর্তবা তো অনেক উপরে। তাঁর গোলামরাও এ রকম নীচুতা থেকে অনেক পবিত্র হয়ে থাকেন। তাঁদের শত্রুদের ব্যাপারেও এ কথা বলতে শোনা যায় :

ہر کہ مارا یار نبود ایزد اورا یار باد – ہر کہ مارا رنج دادہ راحتش بیار باد

ہر کہ او خارے نہد در راہ ما از دشمنی – ہر گلے کز باغ عمرش بشگفد بے خار باد

"যে আমাকে ভালবাসে না আল্লাহ যেন তাকে ভালবাসেন; আমাকে যে কষ্ট পৌছায় তার জীবন যেন শান্তিময় হয়। শত্রুতা করে যে আমার পথে কাঁটা পুঁতে রাখে, তার জীবনের প্রতিটি ফুলই যেন কাঁটা মুক্ত থাকে।"*

খোদ মির্যা সাহেবও এ কথা মেনে নিয়েছেন যে, নেতৃস্থানীয় লোক এবং সে সকল লোক যাঁরা কোনো দীনী মর্যাদাপূর্ণ মর্তবায় বিভূষিত, তাঁদের ধৈর্য, স্থৈর্য, ক্ষমা ও আত্মসংযমের গুণ অর্জন করা অত্যন্ত জরুরী। 'জরূরতুল ইমাম' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন :

---

*কবি জসীমউদ্দিনের ভাষায় :

'আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর,

আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।'–(অনুবাদক)

"যেহেতু ইমামদের বিভিন্ন রকম লম্পট, নীচাশয় ও খারাপ লোকদের সামনে পড়তে হয়, তাই তাদের মাঝে উন্নত মানের চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনিয়। তাহলে তাদের মাঝে ক্রোধ ও উন্মাদনার মত ইন্দ্রিয়াবেগ সৃষ্টি হবে না এবং লোকেরা তাদের ফয়েয থেকে মাহরূম হবে না। এটি বড়ই লজ্জার কথা যে, কোনো ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর বন্ধু বলবে, তার পর কদর্য চরিত্রে ফেঁসে যাবে এবং সামান্য শক্ত কথাও সহ্য করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি নিজেকে যুগের ইমাম বলে দাবী করে এ ধরনের ত্বরলমতি চরিত্রের মানুষ হয়, সামান্য কথায়ও যার মুখে ফেনা এসে যায় ও চোখ নীল বর্ণের হয়ে যায়, সে কিছুতেই যুগের ইমাম হতে পারে না।"[১]

কিন্তু মির্যা গোলাম আহমদ এর বিপরীত। তিনি নিজের বিরোধীদের (যাঁদের মাঝে সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম ও মর্যাদাসম্পন্ন বুযুর্গও রয়েছেন) এরকম বাক্যে নাম উচ্চারণ করেছেন এবং এ ধরনের কঠোর ও অশ্রাব্য ভাষায় কুৎসা রটনা করেছেন যে, ভব্যতার দৃষ্টি বার বার নিচু হয়ে যায় এবং লজ্জায় ললাট ঘর্মাক্ত হয়ে উঠে। ঐ বিরোধীদের জন্য ذرية البغايا (ব্যভিচারিণী মহিলাদের সন্তান) কথাটি প্রয়োগ করা তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।[২] তাঁর এ কুৎসামূলক কথার বেশী প্রমাণ পাওয়া যায় আরবী গদ্যে ও পদ্যে, কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন আঙ্গিকের সাহিত্যের মাঝে কুৎসামূলক রচনার তর্জমা করা সবচেয়ে কঠিন, তাই এখানে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত হল।

'আঞ্জামে আথম' গ্রন্থে পরিশিষ্টে তিনি বলেছেন :

"এরা গালি দিলে আমি তাদের কাপড় খুলে ফেলেছি এবং তাদের এমন মৃত বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছি যে, তাদের চেনাই যায় না।"[৩]

আর এক জায়গায় তিনি নিজের শত্রুদের এ ভাষায় স্মরণ করেছেন :

"শত্রুরা আমাদের বিয়াবানের শুয়োর হয়ে গেছে আর তাদের স্ত্রীরা কুকুরী থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে গেছে।"[৪]

---

১. পৃ-৮

২. দ্রষ্টব্য : 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম', পৃ-৫৪৭; 'নূরুল হক'-১ম খণ্ড, পৃ-১২৩, 'আঞ্জামে আথম', পৃ-২৮২ ইত্যাদি।

৩. পৃ-১৫৮,

৪. নজমুল হুদা, পৃ-১৫

তিনি নিজের প্রতিপক্ষ মৌলবী ছা'দুল্লাহ লুধিয়ানবীকে এরকম শব্দে স্মরণ করেছেন যে, এর তর্জমা করতে কলমও অক্ষম। এ জন্যে আরবী জানা ভাইদের জন্য মূল কবিতাগুলো তুলে দেওয়া হলো :

ومن اللئام ارى رجيلا فاسقا غولا لعينا نطفة السفهاء

شكس خبيث مفسد ومزور نحس يسمى السعد فى الجهلاء

اذيتنى خبثا فلست بصادق ان لم تمت بالخزى ياابن بغاء [৫]

তিনি একই স্থানে সমসাময়িক আকাবের ও বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামকে- যাঁরা ছিলেন হিন্দুস্তানের মাথার মুকুট, আলমে ইসলামের সেরা বুযুর্গ ও প্রখ্যাত আলেম- নিজের ভর্ৎসনা নিন্দার লক্ষ্যে পরিণত করেছেন। তাঁদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী, মাওলানা সাইয়েদ নাযীর হুসাইন মোহাদ্দেসে দেহলবী, মাওলানা আবদুল হক হক্কানী, মুফতী আবদুল্লাহ টুংকী, মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী, মাওলানা আহমদ হাসান আমরূহী এবং হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহীর ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও রয়েছেন। তাঁদের ব্যাপারে তিনি হিংস্র জন্তু, কুকুর, অভিশপ্ত শয়তান, অন্ধ শয়তান, কমবখ্‌ত, অভিশপ্ত ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৬]

এমনিভাবে সে যুগের মশহুর আলেম ও আধ্যাত্মিক রাহনুমা মোহর আলী শাহ সাহেব গোলড়বীর প্রতি কটাক্ষ করে তিনি একটি নিন্দাগাঁথা রচনা করেছেন। যার দু'টি কবিতার তর্জমা তাঁর নিজের ভাষায় নিম্নরূপ :

"অতঃপর আমি বললাম : হে গোলড়ার মাটি, তোমার উপর অভিসম্পাত, অভিশপ্তদের কারণে তুমিও অভিশপ্ত হয়ে গেছ। কিয়ামত দিবসে তুমি ধ্বংসে পতিত হবে। নীচাশয় ব্যক্তিদের ন্যায় এ নিকৃষ্ট ব্যক্তিটি গালি দিয়ে কথা বলেছে। আর সকল মানুষই বিবাদের সময় পরীক্ষায় নিপতিত হয়।"[৭]

এখন ভর্ৎসনা এবং কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেও তাঁর ক্ষুব্ধ অন্তর শান্ত হয় না। কখনো কখনো তিনি শত্রুদের উপর লানত করেন এবং লানতের সংখ্যা অংকে প্রকাশ করার পরিবর্তে 'লানত' শব্দটিকে পৃথক পৃথকভাবে লেখে

৫. আঞ্জামে আথম, পৃ-২৮১-২৮২

৬. দ্রষ্টব্য : 'আঞ্জামে আথম'-এর শেষে মির্যা সাহেবের আরবীতে লেখা দীর্ঘ পত্র, পৃ-২৫১-২৫২

৭. 'এ'জাযে আহমদী', পৃ-৭৫, ৭৬

থাকেন। 'নুযূলুল মাসীহ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে তিনি মাওলানা ছানাউল্লাহ সাহেবের জন্য দশ বার, আর 'নূরুল হক' গ্রন্থে ঈসায়ীদের জন্য এক হাজার বার লা'নত শব্দটি লিখেছেন। এই "লা'নত নামা" তাঁর ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ অন্তরের এক বিচিত্র চিত্র।[৮]

এখানে মির্যা সাহেবের কথার ধরনের কিছু অতিরিক্ত নমুনা পেশ করা হল। এতে তিনি নিজের বিরোধী আলেমদের সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করেছেন। 'আঞ্জামে আথম'-এর এক টীকায় তিনি লিখেছেন :

"হে বজ্জাত মৌলবী সম্প্রদায়, কতদিন পর্যন্ত তোমরা সত্য গোপন রাখবে? সেদিন কবে আসবে যেদিন, তোমরা ইহুদীদের চরিত্র বর্জন করবে? হে জালেম মৌলবী সম্প্রদায়! তোমাদের উপর আফসুস হয়, তোমরা যে বেঈমানীর পেয়ালা পান করেছ, সে পেয়ালাই চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় সাধারণ মানুষকে পান করিয়েছ।"[৯]

অপর এক স্থানে তিনি লিখছেন :

"দুনিয়ার সকল প্রাণীর মধ্যে নাপাক ও নিকৃষ্টতম হলো শুয়োর। তবে শুয়োর থেকেও বেশী নিকৃষ্ট ঐ মানুষগুলো, যারা ব্যক্তিগত আক্রোশে সত্য ও আমানতদারী গোপন করে। হে মরা ভক্ষণকারী মৌলবীরা, হে কদর্য আত্মারা! তোমাদের ব্যাপারে আফসোস হয়, তোমরা আমার প্রতি শত্রুতাবশত ইসলামের সত্য সাক্ষ্য গোপন করেছ। হে অন্ধকারের পোকার দল, তোমরা সত্যতার উদ্দীপ্ত সূর্যকিরণ কিভাবে গোপন করতে পারবে?"[১০]

এরই আরেক স্থানে রয়েছে :

"কিন্তু এ সব লোক কি শপথ করে বলবে? ঘুণাক্ষরেও না। কেননা, তারা তো মিথ্যাবাদী, আর কুকুরের ন্যায় মিথ্যার মৃত জন্তু ভক্ষণ করছে।"[১১]

এ আলোচ্য বিষয়টি লেখকের জন্যও পছন্দনীয় নয়, পাঠকদের কাছেও অপছন্দনীয়। এ জন্য আমি সামান্য ক'টি নমুনা দিয়েই শেষ করছি। "আমার ফুল বাগান দেখে আমার বসন্তকে বুঝে নাও।"

---

৮. 'নূরুল হক' পৃ-১২১-১২৫

৯. 'আঞ্জামে আথম' টীকা, পৃ-২১

১০. 'আঞ্জামে আথম'-এর পরিশিষ্ট, পৃ-২১, (টীকা)

১১. প্রাগুক্ত, পৃ-২৫, টীকা অংশ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা পূর্ণ হয়নি

মোহাম্মদী বেগমের সাথে বিবাহের ভবিষ্যদ্বাণী

১৮৮৮ সনে মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব (যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছর) নিজের এক আত্মীয় মির্যা আহমদ বেগ-এর যুবতী মেয়ে মোহাম্মদী বেগমের সাথে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তাঁর বর্ণনা, আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি এ কাজের নির্দেশ পেয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় এ কাজ পূর্ণ করার ওয়াদা করেছেন। তিনি ১৮৮৮ সনের ১০ই জুলাই তারিখে মুদ্রিত ও বিলিকৃত তাঁর একটি প্রচারপত্রে লিখেছেন :

"এ প্রজ্ঞাবান ও শক্তিশালী খোদা আমাকে বলেছেন : এ ব্যক্তির (আহমদ বেগ) কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহের জন্য প্রস্তুতি নাও এবং তাকে বলে দাও, এ শর্তেই তোমার সাথে সব রকম ভদ্র ব্যবহার করা হবে। আর এ বিবাহ তোমাদের জন্য বরকতের কারণ ও রহমতের নিশানা হবে। আর ঐ সব বরকত ও রহমত থেকে অংশ পাবে, যা ১৮৮৬ সনের ২০ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ইশতেহারে রয়েছে, কিন্তু যদি বিবাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা হয়, তবে এ মেয়ের পরিণাম খুবই খারাপ হবে। যদি অন্য কারুর সাথে তার বিয়ে হয় তবে বিয়ের দিন থেকে আড়াই বছরের মধ্যে সে ব্যক্তি এবং তিন বছরের ভেতর মেয়ের পিতা নিহত হবে। আর তাদের ঘরে কলহ, অভাব ও মসিবত লেগে থাকবে। আর মধ্যবর্তী সময়েও এ মেয়ের কয়েকটি দুঃখজনক ঘটনা সামনে আসবে।"[১]

'ইযালায়ে আওহাম'-এ তিনি এ ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা এভাবে করেছেন :

"আল্লাহ তায়ালা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে এ অভাগার উপর প্রকাশ করেছেন যে, মির্যা আহমদ বেগ হোসিয়ারপুরীর কনিষ্ঠ কন্যা শেষ পর্যন্ত তোমার স্ত্রী হয়ে আসবে। সে সব লোক নানাভাবে শত্রুতা করবে এবং প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে

১. এ ইশতেহার অমৃতসর থেকে $\frac{২০ \times ২৬}{৮}$ এর আট পৃষ্ঠাব্যাপী ছাপানো। মির্যা সাহেব এটি হুবহু 'আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম' বইয়ে উদ্ধৃত করেছেন। (পৃ-২৮৬) আর কাসেম আলী আহমদী সাহেব 'তাবলীগে রেসালাত' প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন। (পৃ-১১১-১১৮)

আর চেষ্টা করবে যাতে এরূপ না হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এরূপই হবে। আর বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সর্বতোভাবে, কুমারী অথবা বিধবা অবস্থায় তাকে তোমার দিকেই নিয়ে আসবেন। সব ধরনের বাধা তিনি মাঝখান থেকে উঠিয়ে নেবেন এবং অবশ্যই তিনি এ কাজ পূর্ণ করবেন। এমন কেউ নেই যে এতে বাধা দেবে।"[২]

ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব ও অকাট্যতা

যদিও এটি ছিল একটি ঘরোয়া বিষয়, আর কোনো ঐতিহাসিক বা সমালোচকের পক্ষে এ ধরনের ঘরোয়া ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করা উচিত নয়। দুনিয়াভর মানুষ বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে থাকে, কখনো মঞ্জুর হয়, কখনো হয় না, কিন্তু এ প্রস্তাব ও এ ঘটনার বিশেষ একটি তাৎপর্য এবং গুরুত্ব রয়েছে। মির্যা সাহেব একে নিজের সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি এবং নিজের সত্যবাদিতার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এ ইশতেহারেই তিনি তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করার পর লিখেছেন :

"মানুষের এ ধারণা যেন স্পষ্ট হয়ে যায়, আমার সত্যতা ও অসত্যতা বিবেচনা করার জন্য আমার ভবিষ্যদ্বাণী থেকে বড় আর কোনো পরীক্ষার কষ্টিপাথর হতে পারে না।"[৩]

এরকম ধারণাও হতে পারে, কখনো কখনো গায়েবী নির্দেশ বুঝতে অসুবিধা হয়ে যায় এবং ঐশীভাবে প্রাপ্ত শব্দ দ্ব্যর্থবোধক হওয়ার কারণে এর কোনো ভুল অর্থ ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু খোদ মির্যা সাহেবের লেখনী দ্বারা জানা যায়, এই ভবিষ্যদ্বাণী যে চ্যালেঞ্জের সাথে বিরোধীদের সামনে পেশ করা হয়েছে, তাতে এ ধরনের সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তিনি বলেন :

"যে সব ভবিষ্যদ্বাণী শত্রুদের সামনে দাবীস্বরূপ পেশ করা হয়, এগুলোর মাঝে বিশেষ ধরনের হেদায়েত ও আলো রয়েছে। যাদের কাছে এলহামস্বরূপ পেশ করা হয়, তারা প্রভুর দরবারে বিশেষভাবে তাওয়াজ্জুহ করে বাকী অর্থ পুরোপুরি স্পষ্ট করে নেন।"[৪]

---

২. ইযালায়ে আওহাম, পৃ-১৯৮

৩. আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃ-২৮৮

৪. ইযালায়ে আওহাম, পৃ-২০২

সম্ভবত মানুষ এ ভবিষ্যদ্বাণীকে তেমন একটা গুরুত্ব দিত না। এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মাঝে মির্যা সাহেবের জীবনের নতুন কোনো কথাও ছিল না। তাঁর রচনাবলী, ইশতেহারসমূহ এবং তাঁর দাওয়াতী যিন্দেগী এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ। তবে বিশেষ করে এ ভবিষ্যদ্বাণীতে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মির্যা সাহেব একে একটি আসমানী নিশানা এবং আসমানী ফয়সালা হিসেবে পেশ করেছেন এবং একে শুধু নিজের সত্য মিথ্যা নয়; বরং ইসলামের জয় পরাজয়ের মাপকাঠি করে নিয়েছেন। তিনি ১৮৮৮ সনের ১০ই জুলাই উল্লিখিত ইশতেহারে লেখেন :

"অতঃপর এ দিনগুলোতে বাড়তি তাফসিলী বিবরণের জন্য বার বার তাওয়াজ্জুহ দেওয়া হলে জানা যায় : আল্লাহ আয়ালা এটা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যার কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে, তার (মির্যা আহমদ বেগ) কনিষ্ঠ কন্যা, যার ব্যাপারে দরখাস্ত করা হয়েছিল, সব বাধা বিপত্তি দূর করার পর অবশেষে আল্লাহ তায়ালা এ অভাগার বিবাহ বন্ধনে নিয়ে আসবেন। আর বেদীনদের মুসলমান করবেন এবং পথভ্রষ্টদের মাঝে হেদায়েত বিস্তৃত করে দেবেন। যেমন, এ ব্যাপারে আরবী এলহামে এরকম রয়েছে :

كذبوا بايتنا وكانوا بها يستهزئون فسيكفيكهم الله
ويردها اليک لا تبديل لكلمت الله ان ربک فعال لما يريد
انت معي وانا معک عسى ان يبعثک ربک مقا مامحمودا

অর্থাৎ, তারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা প্রথম থেকেই হাসি-ঠাট্টা করছিল। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা এ সবের সংশোধনের জন্য, যারা এ কাজে বাধা প্রদান করছে, তোমার সাহায্যকারী হবেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এ মেয়েকে তোমার দিকে ফিরিয়ে আনবেন। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কথাগুলো পরিবর্তন করতে পারে। তোমার প্রতিপালক এমন শক্তিশালী যে তিনি যা কিছু চান তা-ই হয়ে যায়। তুমি আমার সাথে আছ আর আমি তোমার সাথে আছি। অতিসত্বর তোমার সে স্থান মিলবে, যেখানে তোমার প্রশংসা করা হবে। অর্থাৎ যদিও আহমক ও মূর্খ লোক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অশালীন উক্তি করে এবং অশ্রাব্য কথা মুখে আনে, তারা শেষ

পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার সাহায্য দেখে লজ্জিত হবে এবং সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর চতুর্দিক থেকে প্রশংসা শুরু হবে।"[৫]

এর পরও সম্ভাবনা ছিল, মানুষ নিজেদের কর্মব্যস্ততার মাঝে এ ঘটনা ভুলে যাবে, কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে মির্যা সাহেবের এতো বেশি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বার বার তিনি এ কথাটি পুনরাবৃত্তি করছিলেন এবং আরো অধিক শক্তিশালী শব্দ দ্বারা এর ঘোষণা প্রদান করছিলেন। 'আসমানী ফয়সালা' গ্রন্থে তিনি বলেন :দশম ইশতেহার ১৮৮৮ সনের জুলাই'র ভবিষ্যদ্বাণীর অপেক্ষা করবেন, যার সাথে এ এলহামও রয়েছে :

ويسئلونک احق هوقل اى وربى انه لحق وما انتم بمعجزين زوجناكها لا مبدل لكلماتى وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

"এবং তোমাকে জিজ্ঞেস করে : এ কথা কি সত্য? বলো হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ, তা সত্য। আর কেউ তোমার এ কথা বাস্তবে পরিণত হওয়া থেকে বাধা প্রদান করতে পারবে না। আমি স্বয়ং তার সাথে তোমার বিবাহ বন্ধন করে দিয়েছি। আমার কথা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। নিশানা দেখে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং কবুল করবে না। আর বলবে, এটা কোনো পাকা প্রতারণা অথবা পাকা জাদু।"[৬]

হিন্দুস্তানের ওলামা মাশায়েখের নামে আরবীতে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন :

والقدر قدرمبرم من عند الرب العظيم وسيأتى وقته بفضل الله الكريم فوالذى بعث لنا محمدا المصطفى وجعله خير الرسل وخيرالورى ان هذا حق فسوف ترى وانى اجعل هذا النباء معيارا لصدقى وكذبى وما قلت الابعد ما انبئت من ربى [৭]

৫. আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃ-২৮৬, তাবলীগে রেসালাত, ১ম খণ্ড, পৃ-১১৬
৬. ফয়সালায়ে আসমানী, পৃ-৪০
৭. আঞ্জামে আথম, পৃ-২২৩

"তাকদীর তাকদীরে মুবরাম, খোদা তায়ালার পক্ষ থেকে যার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। আল্লাহর ফযলে এর সময় অবশ্যই আসবে। শপথ ওই পবিত্র সত্তার, যিনি মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে সকল আম্বিয়া ও সকল মাখলুকের মাঝে সর্বোত্তম বানিয়েছেন। এটি একটি সত্য ব্যাপার, তোমরা নিজেরাই দেখবে। আর আমি এ ভবিষ্যদ্বাণীকে নিজের সত্য ও মিথ্যার মাঝে মাপকাঠি মনে করি। আমি এ কথা বলিনি, যতক্ষণ না আমার প্রভুর পক্ষ থেকে এর সংবাদ দেওয়া হয়েছে।"

'ইযালায়ে আওহাম'-এ এই ভবিষ্যদ্বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর আসমানী নিদর্শন হওয়ার কথা বর্ণনা করে লিখেছেন :

"এ (ভবিষ্যদ্বাণীর) ব্যাপারে আর্য সমাজের কতিপয় নিরপেক্ষ মানুষও সাক্ষ্য দিয়েছে, যদি এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে যায়, তবে নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর কাজ। আর এ ভবিষ্যদ্বাণী ঘৃণ্য একটি সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়, যারা দুশমনী শত্রুতার তরবারি উঁচিয়ে রেখেছে। তাদের অবস্থা সম্পর্কে যাদের জানা থাকবে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর মাহাত্ম্য তাদের বুঝে এসে যাবে। যে ব্যক্তি এ প্রচারপত্র পড়বে, সে যতই একগুঁয়ে হোক না কেন, তাকে স্বীকার করতে হবে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়বস্তু মানুষের শক্তির ঊর্ধ্বে।"[৮]

কঠিন রোগ এবং মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার আশংকায় মির্যা সাহেব এ বিষয়ে সন্দেহে পতিত হওয়া মাত্র সাথে সাথে নতুন এলহামের মাধ্যমে তাঁকে এ ব্যাপারে সান্ত্বনা দেওয়া হতো। 'ইযালায়ে আওহাম' পুত্রকে তিনি লিখেন :

"যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী জানা গেছে এবং তখনো পূর্ণ হয়নি (যেমন : আজো অর্থাৎ ১৬ই এপ্রিল, ১৮৯১ সন পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি), অতঃপর এ অভাগার কঠিন একটি রোগ হলো। এমনকি মৃত্যু সন্নিকটে মনে করা হলো; বরং মুমূর্ষু অবস্থা দেখে অসিয়্যতও করে দেওয়া হলো। তখন এ ভবিষ্যদ্বাণী চোখের সামনে এসে গেলো। আর মনে হতে লাগল, এখন শেষ মুহূর্ত, কাল জানাযা বের হবে। তখন আমি এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ধারণা করলাম, হয়তো এর অন্য কোন অর্থ হবে, যা আমি বুঝতে পারিনি। তখন ঐ মুমূর্ষু অবস্থায়ই আমার প্রতি এলহাম হলো, اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ

অর্থাৎ, এ কথা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য, তুমি কেন সন্দেহ করছ?"[৯]

---

৮. ইযালায়ে আওহাম, পৃ-১৯৯

৯. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯৮

সারকথা, মোহাম্মদী বেগমের সাথে বিবাহের ব্যাপারটি ছিল মির্যা সাহেবের নিকট একটি পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত বিষয়, যার ফয়সালা আসমানেই হয়ে গিয়েছিল এবং যা পরিবর্তন হওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না। তিনি একে শুধু নিজের সত্যতা ও অসত্যতা নয়; বরং সংবাদ প্রেরণকারীর সত্য মিথ্যার মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছিলেন। আর যেহেতু তিনি নিজেকে ইসলামের সঠিক প্রতিনিধি এবং নিজের সম্মানকে ইসলামের সম্মান মনে করতেন, এ জন্য এখানে ইসলামের জয় পরাজয়ের প্রশ্ন টেনে এনে দাঁড় করিয়েছেন।

মির্যা আহমদ বেগের অস্বীকার এবং মির্যা সাহেবের বাড়াবাড়ি

মির্যা আহমদ বেগ মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের প্রস্তাব মঞ্জুর করেননি এবং নিজের এক বন্ধু মির্যা সুলতান মোহাম্মদের কাছে স্বীয় কন্যা বিবাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। মির্যা সাহেব একথা জানতে পারেন। বিষয়টি (খোদ মির্যা সাহেবের অতি উৎসাহের কারণে) পারিবারিক সীমা অতিক্রম করে সাধারণের মাঝে এসে গিয়েছিল, পত্র পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের শিরোনাম এবং আড্ডা ইত্যাদির আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের কাছে বিষয়টি এতোই চিত্তকর্ষক হয়ে গিয়েছিল যে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে রাজপরিবার এবং বড়দের বিয়েতেও এতখানি হয় না। মির্যা সাহেব নিজেই বারংবার ইশতেহার, ঘোষণা ও চ্যালেঞ্জ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাপারটিকে অত্যন্ত জটিল ও সমস্যাপূর্ণ করে তুলেছিলেন। কন্যার বংশের লোকেরা (মির্যা সাহেবের সাথে যাদের দীনী মতবিরোধও ছিল এবং যাদের আত্মমর্যাদা ও সম্মানবোধে মির্যা সাহেবের পর পর ঘোষণা ও প্রচার দ্বারা আঘাত লেগেছিল) মেয়েটিকে মির্যা সাহেবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ব্যাপারটি এখন এতই জটিল হয়ে গিয়েছিল যে, মির্যা সাহেবের জন্য এ আত্মীয়তা হওয়া একান্তই প্রয়োজন ছিল। তিনি এমন সুস্পষ্ট ও অকাট্য শব্দে এ ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে এ কথা প্রত্যাহার করা বা এর নতুন কোনো ব্যাখ্যা প্রদানও সম্ভবপর ছিল না। খোদ মির্যা সাহেব নীতিগতভাবে এ কথার প্রবক্তা ছিলেন যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার জন্য, যার কাছে ওহী আসে, তার নিজেরও চেষ্টা তদবীর চালাতে হয়, এটা তার দায়িত্ব ও

মর্যাদার বিপরীত নয়।[১০] এ জন্যই মসীহ অবতরণের ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ 'মিনারায়ে শিরক্বী'-নির্মাণের গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং নিজের জীবনেই তা শুরু করে ছিলেন। এ মূলনীতির ভিত্তিতেই তিনি মোহাম্মদী বেগমের পিতা ও অপরাপর আত্মীয় স্বজনকে এই আত্মীয়তা সম্প্রাদনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তিনি এর জন্য উৎসাহ দান ও ভয় প্রদর্শনের সকল মাধ্যম অবলম্বন করেন। তাঁর দরখাস্ত এবং ১০ই জুলাই ১৮৮৮ সনের ইশতেহারেও উভয় দিক (উৎসাহ দান ও ভয় প্রদর্শন) বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বিবাহ হওয়ার ফল স্বরূপ খোদায়ী পুরস্কারের ঘোষণা দেন এবং বিবাহ অস্বীকার করার ফলস্বরূপ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

এ অবস্থায় তিনি কন্যার পিতা মির্যা আহমদ বেগ, ফুফা মির্যা আলী শের বেগ, ফুফী এবং অপরাপর আত্মীয় স্বজন– যাঁরা এ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ, তাঁদের সকলের কাছে অত্যন্ত তোষামোদের ভাষায় অনুরোধ করে চিঠি লিখেছেন, যাতে তাঁরা নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে এ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। তিনি মির্যা আহমদ বেগকে এক পত্রে লিখেছেন :

"যদি আপনি আমার কথা ও বর্ণনা মেনে নেন তবে আমার উপর হবে মেহেরবানী, অনুগ্রহ এবং আমার সঙ্গে হবে উত্তম ব্যবহার। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব এবং আপনার হায়াত দারাযীর জন্য আরহামুর রাহেমীনের দরবারে দোয়া করব। আর আপনার সঙ্গে ওয়াদা করছি, আপনার মেয়েকে আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দিয়ে দেব। আমি সত্য বলছি, আপনি সম্পদের যা চাইবেন আমি তাই আপনাকে দেব।'[১১]

তিনি অপর এক চিঠিতে লিখেন :

---

১০. 'হাকীক্বতুল ওহী' গ্রন্থে তিনি লেখেন : 'যদি ওহীয়ে এলাহী ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ কোনো কথা প্রকাশ করে, তখন যদি কোনো রকম ফেৎনা ও অবৈধ পন্থা ব্যতীত তা পূরণ করা সম্ভব হয়, তবে নিজের হাতে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করা শুধু বৈধই নয় বরং সুন্নত।' পৃ-১৯১

১১. কাযী ফযলে আহমদ সাহেব সংকলিত 'কালেমায়ে ফযলে রহমানী' ('কাদিয়ানী মাযহাব' থেকে সংগৃহীত) মির্যা সাহেবের ঐ সব চিঠির সমষ্টি, যা তিনি মোহাম্মদী বেগমের অভিভাবক ও আত্মীয় স্বজনদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এ পত্রাবলীর সত্যতা এবং এগুলে মির্যা সাহেবের হওয়ার ব্যাপারে, তার নিজেরও অস্বীকৃতি ছিল না।

'এখনো আমি বিনয় ও ভদ্রতার সাথে আপনার খেদমতে নিবেদন করছি, এ আত্মীয়তা থেকে আপনি মুখ ফেরাবেন না, এটা আপনার মেয়ের জন্য খুবই বরকতের কারণ হবে এবং আল্লাহ তায়ালা এমন সব বরকতের দরজা শুলে দেবেন, যা আপনার ধারণাও নেই।"[১২]

মির্যা আলী শের বেগের নামে লেখা অপর এক চিঠিতে রয়েছে :

"আপনার ঘরের সকলে মিলে যদি আপনার ভাইকে বুঝান তবে কেন বুঝবে না! আমি কি মেথর বা চামার যে, আমার কাছে মেয়ে বিয়ে দেওয়া লজ্জার ব্যাপার? বরং সে তো এখনো 'হ্যাঁ'-এর সাথে 'হ্যাঁ' করছে এবং নিজের ভাইয়ের জন্য আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।

এখন এ মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে সকলেই এক হয়ে গেছে। এমনিতে কারুর মেয়ের ব্যাপারে আমার কি গরজ? যেখানে খুশি যাক। তবে এটা তো পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে যে, যাদের আমি আপন মনে করি, আর যাদের মেয়ের জন্য চেয়েছিলাম, তার সন্তান হোক এবং সে সন্তান আমার ওয়ারিস হোক, তারাই আমার রক্তপিয়াসী, তারাই আমার ইজ্জত মেটাবার প্রয়াসী। তারা চায়, যেন আমি লজ্জিত হই এবং আমার মুখ কালো হয়। আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন, তিনি যাকে ইচ্ছা অপমান করেন। তবে এখন তো তারা আমাকে আগুনে নিক্ষেপ করতে চাইছে।"[১৩]

তিনি মির্যা আহমদ বেগের নামে এক চিঠিতে এ-ও লিখেছেন :

"আপনার সম্ভবত জানা আছে, হতভাগার এ ভবিষ্যদ্বাণী হাজারো মানুষের মাঝে মশহুর হয়ে গেছে। আমার ধারণা, সম্ভবত দশ লাখের বেশী লোক এ ভবিষ্যদ্বাণী অবগত হয়েছে।"[১৪]

এ চিঠিতেই তিনি আরো লিখেছেন :

"আমি লাহোর গিয়ে জানতে পারলাম, হাজারো মুসলমান মসজিদে নামাযের পর এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ পাওয়ার জন্য আন্তরিকতার সাথে দোয়া করে।"[১৫]

---

১৩. কালেমায়ে ফযলে রহমানী

১৪. কালিমায়ে ফযলে রহমানী ('কাদিয়ানী মাযহাব' থেকে গৃহীত)

১৫. প্রাগুক্ত

মির্যা সাহেব জানতে পারলেন, তাঁর পুত্র ফযলে আহমদ মরহুমের স্ত্রী ইযযত বিবি, ইযযত বিবির মাতা– যিনি মির্যা আলী শের বেগের স্ত্রী এবং মোহাম্মদী বেগমের ফুফী মির্যা সাহেবের বিবাহে বিরোধিতা করছেন এবং মির্যা সুলতান মোহাম্মদের সাথে মোহাম্মদী বেগমের বিবাহের জন্য চেষ্টা করছেন। মির্যা সাহেব পাত্রীর ফুফা মির্যা আলী শের বেগের কাছে লিখেছেন : "আমি তাঁর (মির্যা আলী শের বেগের স্ত্রীর) খেদমতে চিঠি লেখে দিয়েছি, যদি আপনি নিজের ইচ্ছা থেকে ফিরে না আসেন এবং আপনার ভাই (মির্যা আহমদ বেগ)-কে ঐ বিবাহ থেকে বাধা না দেন, তবে যেমন আপনার ইচ্ছা আমার ছেলে ফযলে আহমদও আপনার মেয়ে (ইযযত বিবি)-কে নিজের বিবাহে রাখতে পারবে না; বরং একদিকে যখন মোহাম্মদীর কারুর সাথে বিবাহ হবে, অপরদিকে ফযলে আহমদও আপনার মেয়েকে তালাক দিয়ে দেবে।

আর যদি তালাক না দেয় তবে আমি তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করব। আর যদি আমার জন্য আহমদ বেগের সাথে মুকাবিলা করেন এবং তার এ ইচ্ছা পরিত্যাগ করাতে সমর্থ হন, তবে আমি মনে প্রাণে হাযির আছি। আর ফযলে আহমদকে– যে এখন আমার আওতায় রয়েছে, সর্বদিক থেকে ঠিক করে দিয়ে আপনার মেয়ের ভূ-সম্পত্তির জন্য চেষ্টা করবো এবং আমার সম্পদ তারই সম্পদ হবে।"[১৬]

মির্যা সাহেব ইযযত বিবির দ্বারাও ওর মায়ের কাছে চিঠি লিখিয়েছেন। তাতে সে লিখেছে, 'যদি তাঁরা নিজেদের ইচ্ছা পরিবর্তন না করেন, তবে সত্যি সত্যি মির্যা সাহেব আমার স্বামীকে দিয়ে আমাকে তালাক দিইয়ে দেবেন। এতে আমার ঘর সংসার বরবাদ হয়ে যাবে।'[১৭]

ফযলে আহমদ নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ফেলেছিলেন। মির্যা সাহেবের অপর ছেলে মির্যা সুলতান আহমদের মোহাম্মদী বেগমের পরিবারের সাথে সখ্যতা ছিল। সুলতান আহমদের মাতাও তার সাথে ছিলেন। এজন্য মির্যা সাহেব মির্যা সুলতান আহমদকে নিজের ভাষায় ত্যাজ্য পুত্র ও মীরাস থেকে বঞ্চিত এবং তার মাকে তালাক দিয়েছিলেন।[১৮]

---

১৬. কালেমায়ে ফযলে রহমানী

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. তাবলীগে রেসালত, ২য় খণ্ড, পৃ-৯৯

শেষ পর্যন্ত ৭ই এপ্রিল ১৮৯২ সনে মির্যা সুলতান মোহাম্মদের সাথে মোহাম্মদী বেগমের বিবাহ হয়ে যায়। মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব এর পরও ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার ব্যাপারে নিরাশ হননি। তিনি ১৯০১ সনে গুরুদাসপুর জেলার আদালতে হলফনামায় বলেন :

"এ কথা সত্য, আমার সাথে সে মেয়েটির বিবাহ হয়নি; তবে আমার সঙ্গে অবশ্যই তার বিবাহ হবে, যেমন ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ রয়েছে। সুলতান মোহাম্মদের সাথে তার বিবাহ হয়েছে। আমি সত্য বলছি, এ আদালতে ঐ সব কথা– যা আমার কাছ থেকে নয়; রবং আল্লাহর তরফ থেকে এ নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়েছে। একদিন আসবে, যখন আশ্চর্য প্রভাবে এবং লজ্জার কারণে সকলের মাথা নিচু হবে। মেয়েটি এখনো জীবিত রয়েছে। আমার বিবাহে সে অবশ্যই আসবে। এতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। আল্লাহর কথা নড়চড় হয় না, অবশ্যই পূর্ণ হবে।"[১৯]

মির্যা সাহেব তাঁর প্রথম ইশতেহারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন : অন্য যে কোন পুরুষের সাথে মোহাম্মদী বেগমের বিবাহ হবে, আড়াই বছরের ভেতর সে মৃত্যু বরণ করবে। এই আড়াই বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। মির্যা সুলতান মোহাম্মদ সাহেব তখনো জীবিত থেকে সুন্দরভাবে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছিলেন। নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পর মির্যা সাহেব এই মেয়াদ আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ১৮৯৬ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে নিজের এক ইশতেহারে লিখেন :

"শাস্তির নির্ধারিত সময় একটি ঝুলন্ত তাকদীর; যা ভয় এবং আশা দ্বারা অন্য সময়ে গিয়ে পড়ে। যেমন, পূর্ণ কুরআন এর সাক্ষী, কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী অর্থাৎ, ঐ মহিলাটি এ অসহায়ের বিবাহে আসা একটি তাকদীরে মুবরাম, যা কোনো অবস্থাতেই টলতে পারে না। কেননা এর জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এলহামে এ বাক্যটি বিদ্যমান রয়েছে : 'লা তাবদীলা লিকালেমাতিল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহর কথা

---

১৯. 'আল-হেকাম' পত্রিকা, ১০ই আগষ্ট, ১৯০১ ঈসায়ী ('কাদিয়ানী মাযহাব' ও তাহকীকে লা ছানী' থেকে সংগৃহীত)

কখনো পরিবর্তন হতে পারে না। সুতরাং যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে আল্লাহর কথাই বাতিল।"[২০]

এ ইশতেহারের অপর স্থানে বিষয়টি মুলতবি হওয়ার কার্যকারণ বর্ণনা করে তিনি বলেছেন :

'কুরআন বলছে : এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীর নির্ধারিত সময়, ঝুলন্ত তাকদীরের প্রকারভেদ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং এগুলোর পরিবর্তন পরিবর্ধনের প্রয়োজন এসে গেলে, এ গুলোর নির্ধারিত সময়সীমা এবং তারিখও পরিবর্তন হয়। এ-ই সুন্নতে এলাহী, যা দ্বারা কুরআন পরিপূর্ণ। অতএব প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণী– যা ওহী বা এলহামের মাধ্যমে হবে, অবশ্যই তা ওই সুন্নত অনুযায়ী হবে, যা আল্লাহ তাআলার কিতাবে বিদ্যমান। এ সময়ে এর দ্বারা এ ফায়দাও হয় যে, দুনিয়া থেকে যে উলূমে রাব্বানী উঠে গেছে, পুনরায় এর উপর ঐ লোকদের দৃষ্টি পড়বে এবং কুরআনকে নতুন করে জানা যাবে।'[২১]

ফল কথা, এ ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হওয়ার ও পূর্ণ হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস মির্যা সাহেবের ছিল। 'আঞ্জামে আথম'এ তিনি লেখেন :

'আমি বার বার বলছি : ভবিষ্যদ্বাণীটি আহমদ বেগের মেয়ের জামাতা (সুলতান মুহাম্মদ)-এর ব্যাপারে তাকদীরে মুবরাম। এর অপেক্ষা করো। যদি আমি মিথ্যাবাদী হই, তবে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে না এবং আমার মৃত্যু এসে যাবে।[২২]

মির্যা সুলতান মুহাম্মদের বয়সে আল্লাহ তায়ালা বড়ই বরকত দিয়েছিলেন। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন। তবে বেঁচে গিয়েছিলেন। মির্যা সাহেবের মৃত্যুর পরও অনেক দিন যাবত তিনি জীবিত ছিলেন।

মির্যা সাহেব ১৯০৮ সনে মৃত্যু বরণ করেন। আর এ বিবাহ তাঁর ভাষা অনুযায়ী যা আসমানে হয়ে গিয়েছিল যমীনে হয়নি, কিন্তু কাদিয়ানী জামাতের

---

২০. তাবলীগে রেসালাত, ৩য় খণ্ড, পৃ-১১৫

২১. প্রাগুক্ত, পৃ-১১৭

২২. আঞ্জামে আথম, পৃ-৩১ (টীকা)

অতি ভক্ত সদস্যদের দৃষ্টিতে এখনো এ বিষয়ে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করা যায় না এবং যতদিন পর্যন্ত মানব জাতির ধারা প্রবাহ চলবে ততদিন পর্যন্ত এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হাকীম নূরুদ্দীন এ বিষয়ে অদ্ভুত এক আলোচনা করেছেন। 'ওফাতে মসীহ মওউদ', শিরোনামে ১৯০৮ ঈসায়ী সনে কাদিয়ানের পত্রিকা 'রিভিউ অফ রেলিজেয' এ মুদ্রিত এক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন :

'এখন ওই মুসলমানদের, যারা কুরআন করীমের উপর ঈমান এনেছে, ওই সকল আয়াত স্মরণ করিয়ে দেওয়া উপকারী মনে করে লিখছি যে, যখন কথা বলার ভেতর শ্রোতার সন্তান, স্থলাভিষিক্ত ও তার অনুসারীরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তাহলে আহমদ বেগের মেয়ে অথবা তার মেয়ের মেয়ে কি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না? আপনাদের ইলমে ফারায়েযে মেয়ের মেয়েকে কি মেয়ের হুকুম দেওয়া হয় না? মির্যা সাহেবের সন্তানরা কি মির্যা সাহেবের ঔরসজাত বংশধর নন? আমি তো বার বার প্রিয় মাহমূদ মিয়াকে বলেছি : যদি হযরতের ওফাত হয়ে যায় আর এ মেয়ে তাঁর বিবাহে না আসে, তবুও আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ আসবে না।[২৩]

---

২৩. রিভিউ অফ রেলিজেয, কাদিয়ান, বর্ষ-৭, সংখ্যা-৭২৬, মাস- জুন ও জুলাই, ১৯০৮ ঈসায়ী, পৃ-২৭৯ ('কাদিয়ানী মাযহাব' থেকে সংকলিত)

চতুর্থ অধ্যায়

কাদিয়ানী মতবাদ : সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

একটি স্বতন্ত্র ধর্ম ও দূরত্ব রক্ষাকারী একটি ভিন্ন সম্প্রদায়

একটি ভুল ধারণা

কাদিয়ানী মতবাদের ব্যাপারে অনেকে একটি ভুল ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, এটি মুসলমানের মাঝে শত শত মতবিরোধ ও চিন্তাগত মত-পার্থক্যের মধ্যে অন্যতম দীনি ও ইলমী চিন্তাধারা। আর এর অনুসারীগণ উম্মতে মুসলিমার মাযহাবী গ্রুপ সমূহেরই একটি গ্রুপ। ইসলামের ফেকাহ ও দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে এটি নতুন কোনো ঘটনা নয়।

কিন্তু গবেষণা ও তীব্র অনুসন্ধিৎসার মন নিয়ে কাদিয়ানী মতবাদ অধ্যয়ন করলে এই ভুল ধারণা আপনিতেই তিরোহিত হয়ে যায় এবং একজন নিরপেক্ষ মানুষ এ সিদ্ধান্তে পৌছে যায় যে, কাদিয়ানী মতবাদ একটি ভিন্ন ধর্মমত এবং কাদিয়ানীরা একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়, যারা দীনে ইসলাম ও উম্মতে ইসলামিয়া থেকে বহুগুণ দূরত্ব রক্ষা করে চলে। আর তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমূদ সাহেবের এ বয়ানে কোনো অতিরঞ্জন বা ভুল বর্ণনা নেই যে, হযরত মসীহ মউউদ আলাইহিস সালামের মুখ নিঃসৃত শব্দগুলো আমার কর্ণে এখনো গুঞ্জরণ সৃষ্টি করছে। তিনি বলেছেন :

"একথা ভুল যে, অপরাপর মানুষের সাথে আমাদের মতবিরোধ শুধু ওফাতে মসীহ বা অন্য কয়েকটি মাসায়েলেই রয়েছে; বরং আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, রাসূলুল্লাহ (সা.), কুরআন, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত- এক কথায়, এক এক করে তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন যে, প্রতিটি অংশের মধ্যে তাদের সাথে আমাদের মতবিরোধ রয়েছে।"[১]

---

১. খুতবায়ে জুমুআ, মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমূদ দ্রষ্টব্য, 'আল-ফযল' পত্রিকা, তারিখ ৩ই জুলাই, ১৯৩১

এবং

'হযরত প্রথম খলীফা ঘোষণা করেছেন, তাদের (মুসলমানদের) ইসলাম ভিন্ন আর আমাদেরও ভিন্ন।'[২]

ইসলামের ইতিহাসে ইতিপূর্বে এ ধরনের আরো একটি মতবাদের নজির পাওয়া যায়। সে মতবাদ ইসলামের নাম ব্যবহার করে এবং নিজের কার্যক্রম মুসলমানের মাঝে সীমাবদ্ধ রেখে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও জীবন বিধানের গোড়া পত্তন করেছিল এবং ইসলামের সীমারেখায় 'রাজত্বের ভেতর রাজত্ব'র ভিত্তি স্থাপন করবার চেষ্টা করেছিল। এটা বাতেনী অথবা ইসমাঈলী মতবাদ। এর সাথে কাদিয়ানী মতবাদের আশ্চর্য রকম মিল খুঁজে যাওয়া যায়।[৩]

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিপরীতমুখী ধর্মীয় বিধান

কাদিয়ানী মতবাদ ইসলামের জীবন বিধান ও জীবনাদর্শের মোকাবিলায় একটি নতুন ধর্মীয় বিধান ও জীবনাদর্শ পেশ করে। সে নিজের মধ্যেই ধর্মীয় জীবনের সকল অংশ ও সকল আবেদনের ছক পূরণ করতে চায়। তার অনুসারীদের সে নতুন নবুয়ত, মহব্বত ও শ্রদ্ধার নতুন কেন্দ্রস্থল, নতুন দাওয়াত, নতুন আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ও পবিত্র ভূমি, নতুন ধর্মীয় নিদর্শনাবলী, নতুন ইমাম ও পথ প্রদর্শক, নতুন আকাবের এবং নতুন ইতিহাস ও ব্যক্তিত্ব দান করে। মোট কথা, সে মনন, চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের একটি নতুন কেন্দ্রভূমি প্রতিষ্ঠিত করে। এটাই তা, যা তাকে একটি ফের্কা এবং ফেকহী বা দর্শনগত কোনো চিন্তাধারার পরিবর্তে স্বতন্ত্র একটি ধর্ম এবং জীবন বিধানের আকৃতি দান করে। এর ভেতর এ কথার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় যে, সে নতুন ধর্মীয় ভিত্তির উপর একটি নতুন সমাজ নির্মাণ করতে এবং ধর্মীয় জীবনকে একটি নতুন আকৃতি ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দান করতে চায়। স্বাভাবিকভাবে এর ফল এই দাঁড়ায়, যারা নিষ্ঠা ও উৎসাহ নিয়ে এ মতবাদ ও দাওয়াত কবুল করে এবং এর আওতায় এসে যায়, তাদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তন

২. প্রাগুক্ত, তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯১৪

৩. দ্রষ্টব্য : 'হামারা ইসমাঈলী মাযহাব আওর উসকা নেজাম' ড. যাহেদ আলী, প্রফেসর নেজাম কলেজ হায়দারাবাদ।

হয়ে যায়। তাদের চিন্তা-চেতনায় পুরনো দীনী কেন্দ্র, প্রতিষ্ঠান (নিজের ব্যাপক অর্থে) এবং ব্যক্তিত্বের স্থলে, নতুন দীনী কেন্দ্র, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিত্ব এসে যায়। তারা একটি নতুন সম্প্রদায় বনে যায়, যারা নিজেদের উদ্দীপনা, চিন্তাধারা, ভক্তি ও ভালবাসায় স্বতন্ত্র একটি ব্যক্তিত্ব এবং অস্তিত্বের অধিকারী হয়ে যায়। বিপরীতমুখিতা এবং স্বাতন্ত্র্যের এ লক্ষণ কাদিয়ানী ধর্মমতের ভেতর শুরু থেকেই কাজ করে আসছিল। যা এখন পরিপূর্ণতা ও পরিপক্বতার এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, কাদিয়ানীরা নির্ভয়ে খোলাখুলিভাবে ইসলামী নিদর্শনাবলী ও পবিত্র ভূমির সাথে কাদিয়ানী নিদর্শন ও পবিত্র স্থানের মোকাবিলা করে থাকে এবং ওগুলোর সমমানের ও একই ওজনের বলে ঘোষণা দেয়। ইসলামী জীবন বিধানে সাহাবায়ে কেরামের যে স্থান ও মর্যাদা রয়েছে, তা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট, কিন্তু কাদিয়ানীরা মির্যা সাহেবের সাথী ও বন্ধু বান্ধবদের সাহাবায়ে কেরামের দর্জায় নিয়ে যায়। একজন দায়িত্বশীল কাদিয়ানী এ চিন্তাধারার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন :

"এ উভয় দল (সাহাবায়ে কেরাম ও মির্যা সাহেবের সহচরবৃন্দ)-এর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা অথবা একদলকে অপর দলের চেয়ে সামগ্রিকভাবে শ্রেষ্ঠ বানানো ঠিক নয়। এ উভয় গ্রুপ মূলত একই জামাতের অন্তর্ভুক্ত। শুধু সময়ের ব্যবধান। ওরা প্রথমবারের নবুয়তের তরবিয়ত পেয়েছে আর এরা দ্বিতীয় বারের।"[৪]

এমনিভাবে তারা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সমাধিকে রওযা শরীফ ও সবুজ গম্বুজের অনুরূপ এবং সমমানের মনে করে। ১৮ই ডিসেম্বর ১৯২২ তারিখে 'আল ফযল' পত্রিকায় কাদিয়ানের প্রশিক্ষণ বিভাগের একটি বিবরণ মুদ্রিত হয়েছে, যাতে তাদের মজলিসের সাথীবৃন্দের যারা কাদিয়ানে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও মির্যা সাহেবের কবরে গিয়ে হাযেরী দেয় না, তাদের দীনের ব্যাপারে আলস্য প্রদর্শন ও রুচি বিকৃতির অভিযোগ করে বলা হয়েছে :

'কি অবস্থা সেই ব্যক্তির যে দারুল আমান (নিরাপত্তার দেশ) কাদিয়ানে আসে, অথচ দুই কদম হেঁটে গিয়ে বেহেশতী কবরস্থানে উপস্থিত হয়নি। সেখানে ঐ পবিত্র রওযা শরীফ রয়েছে যাতে আল্লাহ তায়ালার নির্বাচিত সত্তার

৪. 'আল্ ফয্ল', ২৮ মে, ১৯১৮

মোবারক শরীর প্রোথিত রয়েছে। যাঁকে সর্বোত্তম রাসূল নিজের সালাম পৌছিয়েছেন এবং যার ব্যাপারে হযরত খাতামুন্নাবিয়্যীন এরশাদ করেছেন :

يُدْفَنُ مَعِىَ فِى قَبْرِى

এ হিসেবে মদীনা মুনাওয়ারার সবুজ গম্বুজের নূরের পূর্ণ ছায়া এই সাদা গম্বুজে পড়েছে। আপনারা ঐ বরকত থেকে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন, যা রাসূলে কারীম (সা.)-এর রওযা মুবারকের সাথে নির্দিষ্ট। কতই না দুর্ভাগা সে ব্যক্তি, যে আহমদিয়্যাহ'র হজ্জে আকবরে এই তামাত্তু থেকে মাহরূম থাকে।"[৫]

নতুন নবুয়ত ও নতুন ইসলামের কেন্দ্র হওয়ার ভিত্তিতে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের যে দীনী ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কাদিয়ানের সাথে গড়ে উঠেছে, সে কারণে ওরা এ বিশ্বাস রাখে যে, ইসলামের পুণ্য ভূমিসমূহের মধ্য থেকে কাদিয়ান একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশিষ্ট স্থান। ওরা মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারার সাথে কাদিয়ানের নাম নেওয়াও প্রয়োজনীয় মনে করে। মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমূদ সাহেব নিজের এক ভাষণে বলেছেন :

'আমরা মদীনা শরীফের সম্মান করে খানায়ে কা'বার অসম্মানকারী হই না। এমনিভাবে আমরা কাদিয়ানের ইজ্জত করে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের অসম্মানকারী হতে পারি না। আল্লাহ তায়ালা তিনটি স্থানকেই পবিত্র করেছেন এবং তিনটি স্থানকেই নিজের তাজাল্লী প্রকাশ করার জন্য নির্বাচিত করেছেন।'[৬]

খোদ মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানকে মক্কার পবিত্র ভূমির সাথে উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেন :

زمین قادیاں اب محترم ہے-ہجوم خلق سے ارض حرم ہے

(কাদিয়ানের যমীন এখন সম্মানিত; মানুষের সমাগমের কারণে হরম অঞ্চল বা পবিত্র ভূমি।)

তার মতে কাদিয়ানের উল্লেখ কুরআন শরীফে রয়েছে এবং মসজিদে আকসা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মসীহ মওউদের মসজিদ।[৭]

---

৫. 'আল্ ফযল, বর্ষ-১০, সংখ্যা-৪৮
৬. 'আল ফযল', ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫
৭. 'দুররে ছামীন', পৃ-৫২

মিনারাতুল মাসীহ এর ইশতেহার (২৮ মে, ১৯০০)-এ তিনি লিখেছেন :

'যেমনিভাবে স্থানের ভ্রমণের দিক থেকে আল্লাহ তায়ালা হযরত (সা.)-কে মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছেন, তেমনি সময়ের ভ্রমণের দিক থেকে তাঁকে ইসলামের মর্যাদার সময় থেকে, যা হুযুর (সা.)-এর সময়ে ছিল, বরকতে ইসলামীর সময় পর্যন্ত, যা মসীহ মওউদের সময়কাল, পৌছে দিয়েছিল। সুতরাং এদিক থেকে ইসলামের সর্বশেষ সময় পর্যন্ত আঁ হযরত (সা.)-এর আধ্যাত্মিক ভ্রমণ– মসজিদে আকসা দ্বারা অর্থ হলো, মসীহ মওউদের মসজিদ, যা কাদিয়ানে বিদ্যমান রয়েছে। যার ব্যাপারে 'বারাহীনে আহমদিয়া'য় আল্লাহর কালাম নিম্নরূপ :

مبارك ومبارك وكل امر مبارك نجعل فيه

আর এই মুবারক শব্দটি যা ফায়েল বা মফউলের রূপে এসেছে, কুরআন শরীফের আয়াত "اركنا حوله" এর অনুরূপ। সুতরাং কোন সন্দেহ নেই, কুরআন শরীফে কাদিয়ানের উল্লেখ রয়েছে।[৮]

উল্লিখিত বর্ণনা এবং কাদিয়ানের ব্যাপারে ভক্তি বিশ্বাসের স্বাভাবিক ফল এটাই হওয়ার ছিল যে, এর জন্য হাওদা বেঁধে সফর করা এবং ওখানে বছর বছর উপস্থিত হওয়াকে হজ্জের ন্যায় একটি পবিত্র আমল; বরং এক ধরনের হজ্জ মনে করা হতে লাগল। যেমন, কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শক ও যিম্মাদার ব্যক্তিরা কাদিয়ানের সফরকে 'ছায়া হজ্জ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আর যারা খানায়ে কা'বায় হজ্জের উদ্দশ্যে যেতে পারে না, তাদের জন্য সেখানে যাওয়াকে 'হজ্জে বদল' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমূদ নিজের এক জুমার খুতবায় বলেছেন :

যেহেতু ঐ সব লোকই হজ্জে যেতে পারে, যাদের সামর্থ আছে এবং যারা বিত্তশালী, অথচ খোদায়ী আন্দোলন প্রথমে দরিদ্র শ্রেণীর মাঝেই ছড়ায়, আর শরীয়ত দরিদ্রদের হজ্জের ব্যাপারে অক্ষম করে রেখেছে; এজন্য আল্লাহ তায়ালা অপর একটি 'ছায়া হজ্জ' নির্ধারণ করেছেন। তা হলো সে কওম, যার থেকে

৮.তাযকেরা, অর্থাৎ মজমূয়ায়ে অহীয়ে মুকাদ্দাস, পৃ-৩৪৫, ৩৪৬

তিনি ইসলামের অগ্রগতির কাজ নিতে চান এবং ঐ দরিদ্র অর্থাৎ ভারতীয় মুসলমান এতে শামিল হতে পারে।'[৯]

এ ব্যাপারে এতো বাড়াবাড়ি হতে লাগল যে, কাদিয়ানের সফরকে বায়তুল্লাহর হজ্জের উপরেও প্রাধান্য দেওয়া হতে লাগল। আর এটা সে চিন্তাধারারই স্বাভাবিক ফসল যে, কাদিয়ানী মতবাদ একটি জীবিত ও নতুন ধর্মমত এবং এর কেন্দ্রস্থল একটি জীবিত ও নতুন ধর্মের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র, যেখানে গমন করলে নতুন জীবন এবং নতুন ধর্মীয় শক্তি অর্জন করা যায়। এরই ভিত্তিতে জনৈক কাদিয়ানী বলেছেন :

'যেমন আহমদিয়্যাত ব্যতীত, অর্থাৎ হযরত মির্যা সাহেবকে ছাড়া যে ইসলাম বাকী থাকে, তা শুষ্ক ইসলাম, তেমনি এই 'যিল্লী হজ্জ' বা 'ছায়া হজ্জ' বাদ দিয়ে মক্কাওয়ালা হজ্জও শুকনো হজ্জ রয়ে যায়। কেননা, আজকাল সেখানে হজ্জের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না।'[১০]

স্বাতন্ত্র্যের চেতনা এবং একটি স্বতন্ত্র ধর্ম ও নতুন ইতিহাস শুরু করার অনুভূতি এত বেড়ে যায় যে, কাদিয়ানীরা নিজেদের জন্য নতুন পঞ্জিকার গোড়াপত্তন করে এবং বছরের মাসগুলোর নতুন নামে তারিখ লেখতে তাকে। কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সরকারী মুখপত্র 'আল-ফযল'-এ মাসের যে নাম ছাপা হয়, তা নিম্নরূপ :

সোল্‌হ্‌, তাবলীগ, আমান, শাহাদাত, হিজরত, এহসান, অফা, জহূর, তবূক, ইখা, নবুয়ত, ফাত্‌হ।

নির্ভেজাল ভারতীয় ধর্ম হওয়ার কারণে কাদিয়ানী মতবাদকে সাদর অভিনন্দন

ধর্মীয় এই দৃষ্টিকোণ এবং স্বাতন্ত্র্যবোধের ফল এই দাঁড়ালো যে, আরব জাহান এবং মক্কা মদীনার পরিবর্তে (যা ইসলামের দোলনাস্বরূপ এবং ইসলামী যিন্দেগীর উৎসধারা ও স্থায়ী কেন্দ্রস্থল) কাদিয়ান হয়ে গেল কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মানসিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল। যা এই নতুন

---

৯. 'আল ফযল', ১লা ডিসেম্বর, ১৯৩২

১০. পরগামে সোল্‌হ্‌ -বর্ষ -২১, সংখ্যা-২২

ধর্মমত ও আন্দোলনের প্রকাশ এবং ক্রমোন্নতির কেন্দ্রভূমি। স্বাভাবিকভাবেই এর পরিণতি এই হবে, কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও তাদের অনুসারীদের সম্পর্ক আরব জাহান ও হেজাযের সাথে দিনের পর দিন কমতে থাকবে।

আর তাদের আগ্রহ ও লক্ষ্য হিন্দুস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকবে, যে ভূমি থেকে এ দাওয়াত ও আন্দোলন উঠেছিল এবং যে মাটি থেকে এর আহবানকারী ও ভিত্তি নির্মাতা সৃষ্টি হয়েছেন, অবশেষে সে মাটিতে লালিত বর্ধিত হয়ে নিজের জীবনের মনযিলগুলো অতিক্রম করে সমাধিস্থ হয়েছেন। এটা এই চিন্তাধারার স্বাভাবিক পরিণাম, নির্দিষ্ট সময়ে যা প্রকাশ পাবেই এবং যেভাবে বৃক্ষের ফলের উপর কারো আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত নয়, তেমনি এ সম্প্রদায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তার কর্মপদ্ধতির এই স্বভাবজাত ফলের উপরও আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের এ চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ভারতের উগ্র জাতীয়তাবাদীরা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো। এ জাতীয়তাবাদীদের ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি দীর্ঘ দিনের অভিযোগ এই ছিল, ভারতের মুসলমানদের নাড়ির সম্পর্ক আরব ভূমির সাথে এবং মুসলমানরা সর্বদা আরবের দিকেই তাকায়। এই জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিতে সর্বভারতীয় জাতীয়তা এক হুমকির সম্মুখীন এ কারণে যে, দেশের জনসংখ্যার বহুসংখ্যক সদস্যের একটি বিশেষ অংশের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক একটি ভিন্ন দেশের সাথে রয়েছে। আর তাদের দীনী কেন্দ্র, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, পবিত্র স্থানসমূহ এবং তাদের সোনালী ইতিহাস ভারতবর্ষের পরিবর্তে বাইরের অপর একটি দেশের সাথে জড়িত। ভারতের এ উগ্র জাতীয়তাবাদীরা এদিক থেকে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ধর্ম মতকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দন জানালো যে, এটি একটি নির্ভেজাল ভারতীয় ধর্মমত। এর আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ভারতের বাইরে হওয়ার পরিবর্তে ভারতের ভেতরেই রয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে ভারতের একজাতিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অত্যন্ত সন্তোষজনক, আনন্দদায়ক ও আশাব্যঞ্জক। একটি হিন্দু পত্রিকার হিন্দু প্রবন্ধকার জনৈক ডাঃ শংকর দাস অত্যন্ত সুন্দরভাবে উল্লিখিত ভাবটি ব্যক্ত করেছেন এবং আহমদী মতবাদ একজন মুসলমানের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগিতে যে পরিবর্তন এনে দেয় তা-ও তুলে ধরেছেন। তিনি এ সূক্ষ্ম কথাটি বুঝার ব্যাপারে বড়ই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন যে, কাদিয়ানী

সম্প্রদায় কোনো ইসলামী দল নয়; বরং একটি স্বতন্ত্র ধর্ম ও দূরত্ব রক্ষাকারী একটি ভিন্ন সম্প্রদায়। যা ভারতীয় ভিত্তির উপর একটি নতুন ধর্ম ও নতুন সমাজ নির্মাণ করে। ডাক্তার সাহেব লেখেন :

'এ মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্ন দেশের সামনে রয়েছে, তা হলো : ভারতীয় মুসলমানদের ভেতর কিভাবে জাতীয়তাবাদের প্রেরণা সৃষ্টি করা যায়। কখনো তাদের সাথে লেলদেন, চুক্তি ও প্যাক্ট করা হয়, আবার কখনো বা লোভ দেখিয়ে সাথে মিলানোর চেষ্টা করা হয়; কিন্তু কোনো তদবীরই ফলদায়ক হয় না। হিন্দুস্তানী মুসলমানরা নিজেদের একটি ভিন্ন জাতি মনে করে বসে আছে। দিন রাত ওরা আরবের গীত গায়। যদি তাদের শক্তি থাকতো তবে হিন্দুস্তানকেও আরব নাম দিয়ে দিতো।

এই অন্ধকারে, এই নৈরাশ্যজনক মুহূর্তে ভারতের জাতীয়তাবাদী ও দেশ প্রেমিকদের জন্য আশার একটি আলো ফুটে উঠতে দেখা যাচ্ছে। আশার আলোর এই ঝলকানি হলো, আহমদীদের আন্দোলন। যে পরিমাণ মুসলমান আহমদী মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়বে, তারা কাদিয়ানকে নিজেদের মক্কা মনে করতে থাকবে। অবশেষে ভারত প্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী হয়ে যাবে। মুসলমানদের মাঝে আহমদী মতবাদের উন্নতিই আরব সংস্কৃতি ও প্যান ইসলামিজমকে ধ্বংস করতে পারে। এসো! আমরা আহমদী সম্প্রদায়কে জাতীয় দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করি। পাঞ্জাবের মাটিতে এক ব্যক্তি মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী উঠেছে এবং মুসলমানদের দাওয়াত দিচ্ছে : হে মুসলমানেরা, কুরআন শরীফে আল্লাহ যে নবীর আগমনের উল্লেখ করেছেন, সে নবী আমিই। এসো! আমার ঝাণ্ডাতলে সমবেত হও। যদি সমবেত না হও তবে খোদা তোমাদের কেয়ামতের দিন ক্ষমা করবেন না; তোমরা দোযখী হয়ে যাবে। আমি মির্যা সাহেবের এ ঘোষণার সত্যতা অথবা ভ্রান্তির উপর আলোচনা না করে শুধু এতটুকু প্রকাশ করতে চাই, মির্যায়ী মুসলমান হওয়া দ্বারা মুসলমানের মাঝে কী পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। একজন মির্যায়ী মুসলমানের বিশ্বাস হলো :

১. খোদা সময়ে সময়ে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য একজন মানুষ সৃষ্টি করেন, যিনি সে সময়ের নবী হন।

২. খোদা তায়ালা আরবের মানুষদের মাঝে তাদের নৈতিক অধঃপতনের সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নবী রূপে পাঠিয়েছেন।

৩. হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পর খোদার একজন নবীর প্রয়োজন অনুভব হলো, এজন্য মির্যা সাহেবকে প্রেরণ করেছেন যেন তিনি মুসলমানদের পথ প্রদর্শন করেন।

আমার জাতীয়তাবাদী ভাইয়েরা প্রশ্ন করবেন : এ বিশ্বাসের সাথে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কী সম্পর্ক? এর উত্তর, যেমন একজন হিন্দু মুসলমান হয়ে গেলে তার শ্রদ্ধা এবং ভক্তি রাম, কৃষ্ণ, বেদ, গীতা ও রামায়ণ থেকে উঠে কুরআনও আরবভূমিতে পরিবর্তন হয়ে যায়, তেমনি কোন মুসলমান যখন আহমদী হয়ে যায়, তার দৃষ্টিভংগিতেও পরিবর্তন এসে যায়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি তার ভক্তি কমে যেতে থাকে। এ ছাড়াও যেখানে তার খেলাফত প্রথমে আরব ও তুর্কিস্তানে (তুরস্ক) ছিল, এখন সে খেলাফত কাদিয়ানে এসে যায়। আর মক্কা মদীনা তার জন্য 'কথিত পবিত্র ভূমি' থেকে যায়।

যে কোনো আহমদী, সে আরব, তুর্কিস্তান, ইরান অথবা দুনিয়ার যে কোনো অংশেই থাকুক না কেন, আত্মিক শক্তির জন্য সে কাদিয়ানের দিকে মুখ করে। কাদিয়ানের মাটি তার জন্য 'পুণ্যভূমি'। আর এতেই হিন্দুস্তানের মর্যাদার রহস্য লুক্কায়িত। প্রত্যেক আহমদীর অন্তরেই হিন্দুস্তানের জন্য ভালবাসা থাকবে, কেননা কাদিয়ান হিন্দুস্তানেই অবস্থিত। মির্যা সাহেবও হিন্দুস্তানী ছিলেন এবং এখন যে কয়জন খলীফা এ ফের্কার পথ প্রদর্শন করছেন, সকলেই হিন্দুস্তানী।

আরো অগ্রসর হয়ে তিনি লিখছেন :

'এ একটি কারণেই মুসলমানরা আহমদী সম্প্রদায়কে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। তারা জানে, আহমদী মতবাদই আরবী সংস্কৃতি ও ইসলামের দুশমন। খেলাফত আন্দোলনেও আহমদীরা মুসলমানদের সাথে থাকেনি, কেননা আহমদীরা খেলাফতকে তুরস্ক অথবা আরবে প্রতিষ্ঠিত না করে কাদিয়ানে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ কথা সাধারণ মুসলমানের জন্য, যারা সর্বদা প্যান ইসলামিজম ও প্যান আরবী সংগঠনের স্বপ্ন দেখে, যতই নৈরাশ্যজনক হোক, একজন জাতীয়তাবাদীর জন্য খুবই আনন্দের বিষয়।'[১১]

---

১১. ডাঃ শংকর দাস মোহরাহ, বি.এস.সি.এম .বি.বি.এস. দ্রষ্টব্য ঃ 'বন্দে মাতরম' পত্রিকা, তাং-২২ এপ্রিল, ১৯৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবুয়তে মুহাম্মদীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

খতমে নবুয়ত আল্লাহ তায়ালার পুরস্কার এবং উম্মতে মুসলেমার বৈশিষ্ট্য

এই বিশ্বাস যে, দীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ পয়গম্বর ও খাতামুন্নাবিয়্যীন এবং ইসলাম আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ জীবন বিধান ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা-আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ পুরস্কার ও অনুগ্রহ, যা আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের জন্য নির্ধারিত করেছেন। এ জন্যই একজন ইহুদী পণ্ডিত হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে এর উপর অত্যন্ত আফসোস ও পরিতাপ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, কুরআন শরীফে একটি আয়াত রয়েছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, যদি সে আয়াতটি আমাদের ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থে অবতীর্ণ হতো এবং আমাদের সম্পর্কে হতো, তবে আমরা যে দিন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, সে দিনকে জাতীয় আনন্দোৎসবের দিন হিসেবে পালন করতাম। তার উদ্দেশ্য ছিল, সূরা মায়েদার এ আয়াতটি :

"اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا"

যাতে খতমে নবুয়ত ও নেয়ামত পরিপূর্ণ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) এ নেয়ামতের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য এবং এ ঘোষণার গুরুত্ব অস্বীকার করেননি। তিনি শুধু এতটুকু বলেছেন : আমাদের নতুন কোনো খুশীর দিন বা আনন্দোৎসবের দিনের প্রয়োজন নেই। এ আয়াত এরূপ স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে, যা ইসলামের একটি মর্যাদাসম্পন্ন সম্মিলন ও ইবাদতের দিন। এ স্থলে দুইটি ঈদ একত্রিত হয়ে গিয়েছিল : আরাফাতের দিন (৯ই জিলহজ্জ) এবং জুম'আর দিন।

মানসিক বিশৃঙ্খলা থেকে হেফাজত

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও মিল্লাতের ঐক্য খণ্ড খণ্ড করে দেয় এমন সব আন্দোলন ও দাওয়াতের শিকার হওয়া থেকে এ বিশ্বাস ইসলামকে বাঁচিয়েছে। যে সব আন্দোলন ইসলামের ইতিহাসের সুদীর্ঘ সময়ে আলমে ইসলামের বিস্তৃত অঙ্গনে সময়ে সময়ে দানা বেঁধে উঠেছিল, এ বিশ্বাসের বলেই, ওইসব আন্দোলন, মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার ও ইসলামের অপব্যাখ্যা দানকারীদের হাতের খেলনায় পরিণত হওয়া থেকে ইসলাম রক্ষা পেয়েছে, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে আলমে ইসলামের বিভিন্ন অঞ্চলে যা সৃষ্টি হয়েছিল। খতমে নবুয়তের এ আওতার ভিতরে এ মিল্লাত ওইসব দাবীদারদের হামলা ও আক্রমণ থেকে নিরাপদে ছিল, যারা ইসলামের মূল কাঠামো পরিবর্তন করে নতুন কাঠামো তৈরী করতে চেয়েছিল। আর মুসলিম জাতি ঐসকল ষড়যন্ত্র ও ভয়াবহ হামলা প্রতিহত করতে পেরেছে, যার থেকে পূর্ববর্তী কোনো নবীর উম্মত বাঁচতে পারেনি। এ দীর্ঘকাল পর্যন্ত উম্মতের দীনী ও বিশ্বাসগত ঐক্য একতা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যদি এ বিশ্বাস ও এ প্রাচীর না থাকতো, তবে এ একতাবদ্ধ উম্মত বহুধা বিভক্ত উম্মতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো, যার ফলে প্রত্যেক উম্মতের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হতো আলাদা, একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক উৎসধারা হতো আলাদা, প্রত্যেকের ইতিহাস হতো আলাদা, প্রত্যেকের ধর্মীয় নেতা ও রাহবর হতো পৃথক, প্রত্যেকের অতীত হতো ভিন্ন।

জীবন ও সংস্কৃতির উপর খতমে নবুয়তের এহসান

খতমে নবুয়তের বিশ্বাস মূলত মানবজাতির জন্য একটা মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন। এটা এ কথার ঘোষণা যে, মানবজাতি পূর্ণ যৌবনে পৌছে গেছে এবং তার মাঝে এই যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, সে আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ পয়গাম কবুল করতে পারবে। এখন মানব সমাজের জন্য কোনো নতুন ওহী, কোনো নতুন আসমানী পয়গামের প্রয়োজন নেই। এই বিশ্বাসের দ্বারা মানুষের মাঝে আত্মবিশ্বাসের চেতনা জন্ম নেয়। তার এ কথা জানা হয়ে যায়, দীন উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছে গেছে। এখন দুনিয়ার আর পেছনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। দুনিয়ার এখন নতুন ওহীর জন্য আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠানোর পরিবর্তে আল্লাহর দেওয়া শক্তি দ্বারা ফায়দা হাসিল করা এবং আল্লাহর

নাযিলকৃত দীন ও আখলাকের মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে জীবন সুসজ্জিত করার জন্য যমীনের দিকে এবং নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। খতমে নবুয়তের বিশ্বাস মানুষকে পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে সামনের দিকে নিয়ে যায়। এ বিশ্বাস মানুষের সামনে নিজের শক্তি ব্যয় করার প্রেরণা সৃষ্টি করে এবং মানুষকে তার কর্মের সত্যিকার ক্ষেত্র ও দিক বাতলে দেয়। যদি খতমে নবুয়তের বিশ্বাস না থাকে তবে সর্বদা মানুষ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও আস্থাহীনতায় ভুগবে। সর্বদা সে নিজের দিকে দেখার পরিবর্তে আসমানের দিকে তাকাবে। সর্বদা সে নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহে থাকবে। বারে বারেই তাকে প্রত্যেক নতুন ব্যক্তি এসে এ বলবে, মানবতার ফুল বাগান আজ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল, এখন তা ফুলে ফলে, পত্র-পল্লবে পরিপূর্ণ হয়েছে।[১] এবং সে একথা বুঝতে বাধ্য হবে, এখন পর্যন্ত যখন মানবতার বাগান অসম্পূর্ণ রইল, তবে ভবিষ্যতের কি বিশ্বাস? এমনিভাবে সে বাগানে সিঞ্চন করে তার ফুল ও ফল দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে নতুন মালির অপেক্ষায় থাকবে, যে বাগানকে ফুলে ফলে পরিপূর্ণ করবে।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের দুঃসাহস

ইসলামের বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে যে সব আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, সেগুলোর মধ্যে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। ওইসব আন্দোলন হয়তো ইসলামের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অথবা ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে ছিল।

কিন্তু কাদিয়ানী সম্প্রদায় মূলত নবুয়তে মুহাম্মদীর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র। ইসলামের স্থায়িত্ব ও উম্মতের ঐক্যের বিরুদ্ধে এ সম্প্রদায় একটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এরা খতমে নবুয়ত অস্বীকার করে মূলতঃ ঐ সীমারেখা অতিক্রম করে ফেলেছে, যে সীমারেখা এ উম্মতকে অপরাপর উম্মত থেকে পৃথক করে এবং যা কোনো দেশের সীমানা নির্ধারণ করার জন্য দাঁড় করানো হয়। ডঃ স্যার মুহাম্মদ ইকবাল তাঁর এক ইংরেজী প্রবন্ধে, যা হিন্দুস্তানের বিখ্যাত পত্রিকায় ষ্ট্যাটসম্যান (Statesman) মুদ্রিত হয়েছিল, অত্যন্ত সুন্দরভাবে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের এ ঔদ্ধত্য ও অভিনবত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন :

---

১. দ্রষ্টব্য : মির্যা সাহেবের কবিতা :

روضہ آدم کہ تھا وہ نامکمل اب تلک-میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگ وبار

"মুসলমান অবশ্যই একটি দীনী জামাত, যার সীমারেখা নির্ধারিত। অর্থাৎ একত্ববাদে বিশ্বাস, নবীগণের উপর বিশ্বাস ও রাসূলে কারীমের খতমে রেসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। মূলত এ সর্বশেষ বিশ্বাসটি এমন একটি তাৎপর্যমণ্ডিত বিশ্বাস, যা মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়, আর এ বিষয়টি মীমাংসা করে দেয় যে, কোনো ব্যষ্টি বা কোনো সমষ্টি মিল্লাতে ইসলামিয়ার অন্তর্ভুক্ত কি না। যেমন, ব্রাহ্ম সমাজ আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং রাসূলে করীমকে আল্লাহ তায়ালার পয়গম্বর মানে। তবুও তাদের মিল্লাতে ইসলামিয়ার অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা যায় না, কারণ কাদিয়ানীদের ন্যায় তারাও নবী আগমনের সিলসিলা জারি রয়েছে বলে বিশ্বাস করে এবং রাসূলে করীমের খতমে নবুয়তকে মানে না। যতটুকু আমার জানা আছে, কোনো ইসলামী দল এ সীমারেখা অতিক্রম করার দুঃসাহস করেনি। ইরানের বাহায়ী সম্প্রদায় খতমে নবুয়তের মূলনীতি প্রকাশ্যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে কিন্তু সাথে সাথে তারা এ কথাও স্বীকার কারেছে, তারা ভিন্ন সম্প্রদায়, মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের বিশ্বাস, দীন হিসেবে ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু সোসাইটি অথবা মিল্লাত হিসেবে ইসলাম রাসূলে করীমের ব্যক্তিত্বের অনুগ্রহের কাছে বন্ধকীকৃত। আমার দৃষ্টিতে কাদিয়ানীদের সামনে এখন মাত্র দুটো পথ খোলা রয়েছে : হয়তো তারা বাহায়ীদের অনুসরণ করবে অথবা খতমে নবুয়তের মনগড়া অপব্যাখ্যা ছেড়ে দিয়ে তার মূলনীতি পূর্ণভাবে গ্রহণ করবে। তাদের নতুন ব্যাখ্যা শুধু এই উদ্দেশে যে, তাদের যেন ইসলামের গণ্ডীর ভিতর গণ্য করা হয়। তাহলে এতে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল হবে।"[২]

অপর এক প্রবন্ধে তিনি লেখেছেন :

'মুসলিম জাতি ওইসব সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অধিক অনুভূতিপ্রবণ, যে সম্প্রদায় মুসলিম জাতির ঐক্যের বিরুদ্ধে ভীতির কারণ। যেমন, প্রত্যেক ঐ ধর্মীয় সম্প্রদায়, যা ঐতিহাসিকভাবে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দাবী করে, তবে স্বীয় ভিত্তি নতুন নবুয়তের উপর রাখে এবং নিজেদের অমূলক ধারণা অনুযায়ী তাদের ঐশী নির্দেশগুলোর উপরে যারা বিশ্বাস রাখে না তাদের কাফের মনে করে। মুসলিম জাতি এ ধরনের সম্প্রদায়কে ইসলামের একতার

---

২. হরফে ইকবাল, পৃ-১৩৬-১৩৭

বিরুদ্ধে ভীতির কারণ বলে মনে করে। আর এর কারণ হচ্ছে, ইসলামী ঐক্য খতমে নবুয়ত দ্বারাই সুদৃঢ় থাকে।'

আরো একটু অগ্রসর হয়ে তিনি লিখেন :

"এটা সুস্পষ্ট, ইসলাম যে সকল জামাতকে একই সূত্রে গাঁথায় দাবী করে। এমন সম্প্রদায়ের সাথে কোনো সহমর্মিতা রাখতে পারে না, যা তার বর্তমান ঐক্যের জন্য ভয়ের এবং ভবিষ্যতে মানব সমাজের জন্য বাড়তি বিচ্ছিন্নতার কারণ হবে।"[৩]

নবুয়তের দাবীদারেরা

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী ফল হবে, নবুয়তের সম্মান মর্যাদা ও এবং এ দায়িত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য উঠে যাবে। তিনি নবুয়তের সিলসিলা জারি থাকার উপর কলমের যে শক্তি ব্যয় করেছেন এবং যেভাবে এর প্রচার করেছেন, তিনি এলহামের যে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর উপর যেভাবে নবুয়তের ভিত্তি দাঁড় করিয়েছেন, এর পরিণতি এ-ই হবে যে, নবুয়ত একটা ছেলেখেলায় রূপান্তরিত হয়ে পড়বে। তিনি নবুয়তের ধারাবাহিকতার কথা বলেছেন, শুধু নিজের নবুয়ত প্রামাণ্য ও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য এবং খতমে নবুয়ত অস্বীকার করেছেন শুধু নিজের জন্য, অন্যথায় ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নিজেকেই তিনি খাতামুন্নাবিয়্যীন মনে করেন।[৪]

আল্লামা ইকবালের বলিষ্ঠ ভাষায় :

৩.' কাদিয়ানী আওর জমহুর মুসলমান'– হরফে ইকবাল, পৃ-১২২-১২৩

৪. 'খুতবায়ে এলহামিয়া'য় মির্যা সাহেব বলেন :

فكان خاليا موضع لبنة اعنى المنعم عليه من هذه العبارة فاراداللله ان يتم البناء ويكمل البناء باللبنة الاخيرة ايها الناظرون (ص ١١٢)

তিনি নিজেই এর তরজমা বলছেন : 'এবং এই সৌধে একটি ইটের জায়গা খালি ছিল, অর্থাৎ যাদের উপর নেয়ামত দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলেন এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করবেন এবং সর্বশেষ ইটটি বসিয়ে পূর্ণতায় পৌছিয়ে দেবেন; সুতরাং আমিই সেই ইট।'

'খোদ আহমদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার প্রমাণ উপস্থাপনা– যা মধ্যযুগের দার্শনিকদের জন্য সন্দেহ-সংশয়ের কারণ হতে পারে– যদি অন্য কোন নবী সৃষ্টি না হতে পারে তবে পয়গম্বরে ইসলামের রূহানিয়াত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি স্বীয় দাবী– পয়গম্বরে ইসলামের রূহানিয়াতে নতুন পয়গম্বর সৃষ্টি হওয়ার শক্তি ছিল– এর পক্ষে নিজের নবুয়তকে পেশ করে থাকেন, কিন্তু আপনি যদি তাঁর কাছে পুনরায় জিজ্ঞেস করেন : মুহাম্মদ (সা.)-এর রূহানিয়্যাত একের অধিক নবী সৃষ্টি করতে কি সক্ষম? তবে এর উত্তর আসবে, নাসূচক। এ ধারণা এ কথারই সমার্থবোধক যে, মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবী নন, আমিই শেষ নবী। এ কথা বুঝার পরিবর্তে, খতমে নবুয়তের ইসলামী ধারণা মানব জাতির ইতিহাসে সাধারণভাবে এবং এশিয়ার ইতিহাসে বিশেষ করে কী পরিমাণ সাংস্কৃতিক মর্যাদা রাখে, আহমদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার ধারণা হলো, খতমে নবুয়তের ধারণা এই অর্থে, মুহাম্মদ (সা.)-এর কোন অনুসারী নবুয়তের মর্তবা হাসিল করতে পারবে না, খোদ মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তকে অসম্পূর্ণ করে দেয়। যখন আমি আহমদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার ধ্যান-ধারণাকে তার নবুয়তের দাবীর আলোকে অধ্যয়ন করি, তখন আমার মনে হয়, তিনি নিজের দাবীর পক্ষে পয়গম্বরে ইসলামের সৃজনশীল শক্তিকে শুধু একজন নবী, অর্থাৎ আহমদী সম্প্রদায়ের উদগাতার জন্ম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে পয়গম্বরে ইসলামের আখেরী নবী হওয়া অস্বীকার করে ফেলেন। এভাবে এই নতুন পয়গম্বর নিজের আধ্যাত্মিক পূর্বসূরীর খতমে নবুয়তের উপর নীরবে হস্তক্ষেপ করে বসে।'[৫]

কিন্তু মানুষের মন এই সূক্ষ্ম দর্শন বুঝতে অক্ষম যে, হুযুর (সা.)-এর নবুয়ত সৃষ্টি করার শক্তি একটি মাত্র সত্তার অস্তিত্বের জন্য নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ইতিপূর্বে এ শক্তি নিজের কাজও করেনি, আর এ ব্যক্তির (যিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর তেরশ' বছর পর এসেছেন এবং এর পর জানা নেই, দুনিয়া কত হাজার বছর পর্যন্ত থাকবে) পরও কোনো কাজ করতে পারবে না। যেমন, অন্যদের আলোচনায় খোদ মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমূদ সাহেব লেখেছেন :

আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের ব্যাপারে বলেন :

---

৫. পণ্ডিত নেহরুর প্রশ্নসমূহের উত্তর– 'হরফে ইকবাল', পৃ-১৫০,১৫১

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

অর্থাৎ তারা আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা বোঝেনি এবং এটা বুঝেছে, আল্লাহর খাযানা নিঃশেষ হয়ে গেছে, এ জন্য কাউকে কিছু দিতে পারবে না। এমনিভাবে এ কথা বলে, খোদাভীতিতে যতটুকুই বেড়ে যাক, পরহেজগারীতে কয়েকজন নবীকেই অতিক্রম করে ফেলুক, আল্লাহর সান্নিধ্য যতটুকুই অর্জন করুক না কেন, আল্লাহ তাকে কখনো নবী বানাবেন না। তাদের একথা বুঝা আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা না বুঝার কারণেই হয়েছে। অন্যথায় একজন নবী কেন, আমি তো বলি : হাজারো নবী হবেন।"[৬]

যেমন, মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের পর কিছু মানুষের নবুয়তের দাবী উত্থাপনের ব্যাপক দুঃসাহস হয়ে গেছে। আমাদের কাছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে, মোটামুটিভাবে যা বিস্তারিত বিবরণসহ সংরক্ষিত রয়েছে– আকবর ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জানা নেই, যে খতমে নবুয়র অস্বীকার ও নতুন ধর্ম প্রকাশ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। আকবরও এতো সুশৃংখল ও সুস্পষ্টভাবে নতুন নবুয়তের দাবী তোলেনি। কিন্তু মির্যা সাহেবের পর এ দরজা সাধারণভাবে খুলে গেছে। প্রফেসর ইলিয়াস বারানী সাহেব ১৩৫৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৬ পর্যন্ত সাতজন নবুয়তের দাবীদারের কথা বলেছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই, যদি বেশী গুরুত্ব দিয়ে ওইসব নবুয়তের দাবীদারদের গণনা করা হয়, তবে একমাত্র পাঞ্জাবেই এর চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যা প্রমাণিত হবে। নবুয়তের সে সকল দাবীদারের খামখেয়ালীর বিপক্ষে খোদ মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমূদ সাহেবই প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। একটি ভাষণে তিনি বলেছেন :

"দেখো, আমাদের জামাতেই কতজন নবুয়তের দাবীদার দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের মাঝে একজন ব্যতীত সকলের ব্যাপারেই আমি এ খেয়াল রাখি, তারা মিথ্যা কথা বলেন না। আসলে, প্রথমে তাদের এলহাম হয়েছে, এবং আশ্চর্যের কথা নয়, এখনো হচ্ছে। তবে তাদের ত্রুটি হচ্ছে, তারা নিজেদের এলহাম বুঝতে ভুল করেছেন। তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ এমনো আছেন, যাদের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগতভাবে জানাশোনা আছে। আমি সাক্ষ্য দিতে পারি, তাদের মাঝে নিষ্ঠা ছিল, খোদাভীতি ছিল। সামনে আল্লাহই জানেন, আমার এ

৬. 'আনওয়ারে খেলাফত', পৃ-৬২

ধারণা কতটুকু যথাযথ, তবে শুরুতে তাদের অবস্থা ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ। তাদের এলহামের একটি অংশ খোদায়ী এলহাম ছিল। তবে ত্রুটি এই হয়ে গেছে, তারা এলহামের রহস্য বুঝতে সক্ষশ হয়নি এবং হোঁচট খেয়েছে।"[৭]

মুসলমানের মাঝে আত্মকলহ

এ নতুন নবুয়ত দ্বারা আলমে ইসলামে যে রকম বিশৃঙ্খলা, মুসলমানের ভেতর যে ভয়াবহ আত্মকলহ, উম্মতের ঐক্যে যে দুঃখজনক ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, এর চিন্তা করলেও একজন মুসলমানের গা শিউরে না উঠে পারে না। ধর্মহীনতা ও ধর্মবিমুখতার এ যুগে স্বভাবতই মানুষের 'ভেতর আনাল হক্ব' ও 'আনান্নাবিয়্যু' বলার আগ্রহ রয়নি, কিন্তু মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের রচনাবলীর প্রতিক্রিয়া ও কাদিয়ানী মোবাল্লেগীনের প্রচারণার বদৌলতে যদি আজ আলমে ইসলামে নবুয়তের দাবী তোলার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং মুসলিম জাহানের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজের নবুয়তের পতাকা উড্ডীন করে, আর যে বা যারা এ পতাকার ছায়াতলে আশ্রয় না নেয়, নবুয়তের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে তাদের কাফের বলা শুরু হয়ে যায়, তবে ইসলামী দুনিয়ায় কি রকম বিশৃঙ্খলা ও আত্মকলহের সৃষ্টি হতে পারে? আর মুসলিম জাহান কি রকম দলে উপদলে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে? যে উম্মতের আবির্ভাব ঘটেছে বর্ণ, গোত্র ও সম্প্রদায়গত বিচ্ছিন্নতা মিটাবার জন্য, যে উম্মতের আগমন ঘটেছে সকল মানবজাতির একজনকে অপরজনের ভাই ও সহমর্মী বানাতে, কিভাবে সে উম্মত দীনী একগুঁয়েমি ও পরস্পর আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হবে? কিভাবে একে অপরকে কাফের বলতে শুরু করবে? এ আশংকার কথা অনুভব করেছিলেন মৌলবী মুহাম্মদ আলী লাহোরীও।

একটি নিবন্ধে তিনি একথা অত্যন্ত সুন্দর ও বলিষ্ঠভাবে নিজে প্রকাশও করেছিলেন, কিন্তু তিনি চিন্তা করেননি, এ ভয়াবহ দরজা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবই খুলেছেন। ইসলামের পুরো ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি নবুয়তের ধারাবাহিকতা জারি থাকাকে একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের রূপ

---

৭. 'আল ফযল', ১লা জানুয়ারী, ১৯৩৫

দিয়ে পেশ করেছেন। মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের উদ্দেশ করে লেখেছেন :

'আল্লাহর ওয়াস্তে চিন্তা করুন, মির্যা সাহেবের এ বিশ্বাস যদি যথার্থ হয়, নবী আসতে থাকবেন এবং হাজারো নবী আসবেন,[৮] যেমন তিনি স্পষ্টভাবে 'আনওয়ারে খেলাফতে' লিখে দিয়েছেন, তাহলে এ হাজারো গ্রুপ একে অপরকে কাফের আখ্যা দানকারী হবে কি না এবং তখন ইসলামী ঐক্য কোথায় যাবে? এ কথাও যদি মেনে নেয়া যায়, সে সব নবী আহমদী জামাতেই হবে; তাহলে আহমদী জামাতের কয়টি টুকরো হবে? অতীত যুগের রীতি-নীতি থেকে আপনারা এতটুকু অজ্ঞ নন। নবীর আগমনের পর কিভাবে একটি দলের সাথে তার বিরোধে বাধে। সেই খোদা– যিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহকে একত্র করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তিনি কি এখন মুসলমানদের এভাবে খণ্ড বিখণ্ড করে দেবেন, একে অপরকে কাফের বলতে শুরু করবে এবং পরস্পরে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে? স্মরণ রাখুন, ইসলামকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করার ওয়াদা যদি সত্য হয়, তবে দীনে ইসলামের উপর এ মসিবত কখনো আসতে পারে না যে, হাজারো নবী স্ব স্ব পাড়া নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে ফিরবে; হাজারো দেড় ইটের মসজিদ হবে, যার পূজারীরা নিজ নিজ জায়গায় ঈমান ও নাজাতের ঠিকাদার হয়ে থাকবে এবং অপরাপর মুসলমানদের কাফের বেঈমান সাব্যস্ত করে বসবে।"[৯]

একটি ভুল ও ভয়াবহ সিদ্ধান্ত

মির্যা সাহেবের একটি সিদ্ধান্ত ইসলামী ধ্যান ধারণার জন্য হতাশা ও ইসলামী সমাজের জন্য কুৎসিত বিশৃঙ্খলার স্বতন্ত্র একটি দরজা খুলে দেয়। সিদ্ধান্তটি হলো : আল্লাহর সাথে কথোপকথনকে তিনি ধর্মের সত্যতার জন্য শর্ত এবং মুজাহাদা'র স্বাভাবিক পরিণতি মনে করেন। তাঁর নিকট যে ধর্ম ও মাযহাবে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথনের ধারাবাহিকতা জারি নেই, সে

---

৮. মুহাম্মদ আলী সাহেব এ বিশ্বাসের সূচনাকারী বা লালনকারী নন, তিনি মির্যা সাহেবের ভাষ্যকার মাত্র।

৯. রদ্দে তাকফীরে আহলে কেবলা, পৃ-৪৯-৫০

মাযহাব মৃত ও প্রক্ষিপ্ত; বরং তা শয়তানী মাযহাব, আর তা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর যে মাযহাবের অনুসারী খোদাভীতি এবং মুজাহাদা সত্ত্বেও এ দৌল থেকে মাহরূম সে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ ও অন্ধ। 'বারাহীনে আহমদিয়া'র পঞ্চম খণ্ডে তিনি লেখেছেন :

'এ রকম নবী কি ধরনের সম্মান, কি ধরনের মর্তবা, কি ধরনের প্রভাব এবং কি ধরনের ঐশ্বরিক শক্তি নিজের অস্তিত্বে রাখেন, যার অনুসারীরা শুধু চক্ষুহীন ও অন্ধ হয়, আল্লাহ তায়ালা নিজের কথাবার্তা এবং সম্বোধন দ্বারা তাদের চক্ষু খোলে না? এটা কত বড় বাজে ও ভ্রান্ত আকীদা যে, এ ধরনের খেয়াল করা হবে, হুযুর (সা.)-এর পর ওহীয়ে এলাহীর দরজা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত এর কোনো আশাই নেই। শুধু ঘটনাবলীর পূজা করো। সুতরাং এ ধরনের মাযহাব কি কোনো মাযহাব হতে পারে, যাতে সরাসরি আল্লাহ তায়ালার কোনো খবরই জানা যায় না। যা কিছু আছে– শুধু কেসসা! তাঁর রাস্তায় যদিও কেউ নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সকল কিছুর উপরে তাঁকে গ্রহণ করে, তবুও তিনি ওই ব্যক্তির সামনে আপন পরিচয়ের দরজা খোলেন না এবং সরাসরি কথাবার্তা সম্বোধন দ্বারা তাকে সম্মানিত করেন না। আমি আল্লাহ তায়ালার শপথ করে বলছি : এ যমানায় এ ধরনের মাযহাব থেকে আমার চাইতে বেশী নিরাসক্ত আর কেউ নেই। আমি এ ধরনের মাযহাবের নাম রাখি শয়তানী মাযহাব। আমি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি এটা রহমানী মাযহাব নয়।'[১০]

কথোপকথনকে শর্ত বানানোর পরিণাম

মির্যা সাহেব আল্লাহর সাথে সরাসরি কথাবার্তাকে পরিচয়, নাজাত, সত্যবাদিতা ও হক্কানিয়াতের পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা দিয়ে, যে মাযহাবকে আল্লাহ তায়ালা সহজ ও সকলের জন্য আমলের উপযোগী বানিয়েছেন, সে মাযহাবকে অত্যন্ত কঠিন ও সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

১০. বারাহীনে আহমদিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৮৩

–'আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং তোমাদের জন্য যা ক্লেশকর তা চান না।'– (আল বাকারা : ১৮৫)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

–'তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।'– (হাজ্জ : ৭৮)

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

–'আল্লাহ কারো উপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।'– (বাকারা : ২৮৬)

কিন্তু নাজাতের জন্য আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথন যদি শর্ত হয়, তবে এ দীন থেকে অধিক কঠিন আর কোনো বস্তু হবে না। কেননা, অনেক মানুষ এমন আছে, যারা প্রকৃতিগতভাবেই এ এলহাম ও কথাবার্তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না, সে যতই সাধনা করুক না কেন। এলহাম ও কথোপকথনের দরজা তার সামনে খুলবে না। অনেক লোক এমন আছে, সৃষ্টিগতভাবে যাদের এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে; কিন্তু তাদের ঐ সাধনার (যা আল্লাহর সাথে কথাবার্তার জন্য শর্ত) সুযোগ বা তৌফিক নেই। ঐ সর্বব্যাপী মাযহাব, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য যার আর্বিভাব এবং যা সকলকে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেয়, নাজাত, ক্ষমা, আল্লাহর, সন্তুষ্টি এবং আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার জন্য এত কড়া শর্ত আরোপ করতে পারে না, লক্ষ কোটি মানুষের মাঝে গুটিকয়েক মাত্র মানুষও যা পূর্ণ করতে সক্ষম হয়।

অপরদিকে কুরআন শরীফে মু'মিনীন ও সফলকাম মানুষগুলোর গুণাবলী দেখা যেতে পারে। সুরা আল মু'মিনুন-এর প্রথম রুকু পড়ুন-

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ

সূরা আল ফুরক্বানের সর্বশেষ রুকু পড়ুন–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا

প্রথম সূরার প্রথম আয়াত পড়ুন–

الٓمٓ ۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ
يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

–'এ সেই কিতাব, যাতে কোনই সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য যা পথ-নির্দেশ, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের আমি যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।'

এ আয়াতগুলোর কোথাও আল্লাহর সাথে কথাবার্তাকে হেদায়েত ও কল্যাণের জন্য শর্ত হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়নি; বরং এর উল্টো 'ঈমান বিল গায়েব' বা অদৃশ্যে বিশ্বাসকে হেদায়েতের জন্য প্রথম শর্ত হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ঈমান বিল গায়েব-এর অর্থই হলো : নবীর উপর আস্থা রেখে (যাকে আল্লাহ তায়ালা আপন ইচ্ছায় আল্লাহর সাথে কথাবার্তার জন্য নির্বাচিত করেন) গায়েবী রহস্যবলী- যা শুধু জ্ঞান এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায় না– মেনে নেওয়া। যদি মির্যা সাহেবের এ কথা মেনে নেওয়া হয়, আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলা নাজাতের পূর্বশর্ত, তবে ঈমান বিল গায়েবের প্রয়োজন আর থাকে না এবং এর উপর কুরআন এত জোর দিলো কেন তা-ও বুঝে আসে না। আর সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগী আমাদের সামনে রয়েছে। জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, তাঁদের মধ্যে থেকে কতজন আল্লাহর সাথে কথাবার্তা এবং আল্লাহর সম্বোধনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন? হাদীস ও ইতিহাস দ্বারা কতজনের ব্যাপারে প্রমাণ করা যেতে পারে যে, আল্লাহর সাথে তাঁদের কথোপকথন হয়েছিল? ঐ যুগের ইতিহাস এবং ঐ মোবারক জামাতের প্রকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তি এ দাবী উঠাতে পারবে না যে, এক লাখের বেশী এ পবিত্র জামাতের কারোর আল্লাহর সাথে কথাবার্তা হয়েছিল। আর সাহাবায়ে কেরামেরই যখন এ অবস্থা, তবে পরবর্তীদের ব্যাপারে আর কি বলা যেতে পারে?

সিলসিলায়ে নবুয়ত অস্বীকার

আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথনের এই গুরুত্ব ও সার্বজনীনতা মূলত পর্দার আড়াল থেকে নবুয়তের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ এবং একটা গোপন ষড়যন্ত্র। আল্লাহর সাথে কথা বলার এই সার্বজনীনতা ও ধারাবাহিকতার পর,

নবুয়তের সিলসিলার কোনো যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজন আর বাকি থাকে না। কুরআন মজীদ ও সকল আসমানী ধর্ম-মানুষের হেদায়েত, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী ও আল্লাহর ইচ্ছার পরিচয় এবং অদৃশ্য রহস্যের জ্ঞানকে সিলসিলায়ে নবুয়তের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। কুরআন হেদায়েতপ্রাপ্ত মু'মিনদের ভাষায় বলছে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَآئَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

–'প্রশংসা সে আল্লাহরই যিনি আমাদের এ পথ দেখিয়েছেন, আল্লাহ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনো পথ পেতাম না, আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণী এনেছিলেন।'– (আ'রাফ-৪৩)

আর এক জায়গায় আল্লাহর জাত ও সিফাতের ব্যাপারে জাহেলী ও মুশরেকী ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসকে খণ্ডন করে এরশাদ হয়েছে–

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

–'ওরা যা আরোপ করে তা থেকে পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি, প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।'– (সাফফাত: -১৮০, ১৮১, ১৮২)

নবীগণকে পাঠানোর যৌক্তিকতা ও প্রয়োজন নির্দেশ করে এরশাদ হয়েছে :

لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ–

–'যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে।'– (নিসা : ১৬৫)

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের ওহীর ধারাবাহিকতা চালু থাকা ও আল্লাহর সাথে কথোপকথনের দর্শন এবং এ দর্শনের অনিবার্য পরিণামের উপর যদি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করা হয় এবং এলমীভাবে এ দর্শনকে ব্যবচ্ছেদ করা হয় তবে, এখানে খতমে নবুয়তের পরিবর্তে সিলসিলায়ে নবুয়ত অস্বীকার করার দৃষ্টিভঙ্গিই পরিলক্ষিত হয়। আর হেদায়েত ও মারেফতে এলাহীও 'ম্যাসওমারিজম' এবং আধুনিক আত্মা উপস্থিত করার আন্দোলন (Spiritual ISM) ইত্যাদির ন্যায় একটি আত্মিক সাধনা হয়ে পড়বে।

আল্লাহর সাথে কথোপকথনের উৎস নির্ধারণ

অতঃপর আল্লাহর সাথে কথোপকথন ও আল্লাহর সম্বোধন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার মাপকাঠি কি? আর এর কি যামানত আছে যে, মানুষ যা কিছু শুনছে তা তার ভেতরের কোনো আওয়ায বা তার পারিপার্শ্বিক কোনো প্রতিধ্বনি অথবা তার ভেতরকার ব্যক্তিগত কামনা এবং সোসাইটির প্রতিক্রিয়ার ফল নয়? যারা ঐশী ইংগিত ও কথোপকথনের পুরনো সমষ্টি দেখেছেন, তাদের জানা আছে, এর কত বড় অংশ কাল্পনিক কথা ও প্রক্ষিপ্ত চিন্তাধারার লালন এবং প্রসার ঘটায়, যা পুরাণ (My thology) সৃষ্টি করেছিল। মিসরের নব্য প্লেটোবাদ (New platonism)-এর 'আল্লাহর জ্যোতি দেখা' ও 'আল্লাহর সাথে কথোপকথন' লক্ষ্য করা যেতে পারে। তাদের ওই ঐশী ইঙ্গিত এবং কথোপকথন সে সময়ের দার্শনিক ও পৌরাণিক কাহিনীকারদের বানোয়াট কল্পিত কাহিনী কি বিশ্বাস করেনি? খোদ ইসলামী যুগেও কোনো কোনো ঐশী ইঙ্গিতপ্রাপ্ত বলে দাবীদার, 'আক্বলে আউয়ালের' সাথে মোসাফাহা করা এবং এর সাথে কথাবার্তা বলার ব্যাপার বর্ণনা করে; যা পুরনো প্রক্ষিপ্ত দর্শন বরং গ্রীক পুরাণের একটি কাল্পনিক ধারণামাত্র। খোদ মির্যা সাহেবের কথোপকথনের একটি বিরাট অংশ তার যুগ, পারিপার্শ্বিকতা ও সমাজের প্রতিক্রিয়ায় প্রভাবান্বিত এবং সে পতনোন্মুখ সোসাইটির প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়, যে সমাজে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন এবং যেখানে নিজের দাওয়াত নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বরং একটি বড় অংশ এ ধরনের, যার ব্যাপারে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে অভিজ্ঞ একজন পর্যবেক্ষকের মনে হয় : এর উৎস আলেমুল গায়েব আল্লাহ তায়ালা নয়; বরং ভারতের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণকারী শাসনব্যবস্থা।

বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর স্যার মুহাম্মদ ইকবাল– যিনি মির্যা সাহেবের মতবাদ এবং তার এলহামসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন- এ রহস্য নিজস্ব যুক্তিপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে সুন্দররূপে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরুর কতিপয় প্রশ্ন ও সন্দেহের উত্তরে লিখিত এক নিবন্ধে তিনি বলেছেন :

'আমি এ কথা অবশ্যই বলব, আহমদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা একটি আওয়ায শুনেছে, কিন্তু এ বিষয়ের ফয়সালা যে, এ আওয়ায কি ঐ খোদার পক্ষ থেকে যার হাতে জীবন ও শক্তি রয়েছে, অথবা মানুষের আত্মিক শূন্যতা থেকে

সৃষ্টি হয়েছে, তা এই সম্প্রদায়ের গতি প্রকৃতির উপর সীমাবদ্ধ হওয়া চাই, যা এ আওয়াযের প্রকাশস্থল, ওই চিন্তাধারা এবং আবেগের উপরও, যা এ আওয়ায তার শ্রবণকারীদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছে। পাঠকগণ এ কথা মনে করবেন, আমি রূপক কথা ব্যবহার করছি। অতীত দিনের জাতিসমূহের জীবন ইতিহাস বলে : যখন কোনো জাতির যিন্দেগীতে পতন শুরু হয়ে যায়, তখন পতনই এলহামের বুনিয়াদ হয়ে যায় এবং ওই জাতির কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সুফী, সাধক ও চিন্তাবিদরা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর মুবাল্লিগদের এমন একটি জামাত অস্তিত্বে এসে যায় যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে, ধাঁ ধাঁ লাগানো কথার তুবড়ি দিয়ে সংশ্লিষ্ট জাতির জীবনের ঐ অধ্যায়ের পঞ্চমুখে প্রশংসা করা, যা অতিশয় ঘৃণ্য ও অপমান জনক। এই মোবাল্লেগরা অবচেতনভাবে আশার সুন্দর মোড়কে হতাশা গোপন করে এবং অতীত দিনের সুকীর্তির ক্ষমতা সমূলে উৎপাটিত করে। এভাবে এক সময় তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা মিটিয়ে দেয়। তাদের ইচ্ছাশক্তির উপর সামান্য চিন্তা করো, যাদের এলহামের ভিত্তি এই বলা হয়ে থাকে যে, নিজের রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতাকে দৃঢ় মনে কর। সুতরাং আমার ধারণায় ওই সব অভিনেতা, যারা আহমদিয়াতের নাটকে অংশ নিয়েছে, পতন ও অধোগতির হাতে কাঠের পুতুল হয়ে রয়েছিল মাত্র।[১১]

---

১১. হরফে ইকবাল, পৃ-১৫-১৫৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লাহোরী শাখা ও তাদের আকীদা

মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবের তাফসীর এবং লাহোরী শাখার বিশ্বাস ও চিন্তাধারা

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের যে শাখার কেন্দ্র প্রথমে কাদিয়ানে এবং বর্তমানে রাবওয়ায় অবস্থিত এবং যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমূদ সাহেব– এ শাখা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুয়তের বিশ্বাসকে নিজেদের জামাতের মূলনীতি বানিয়েছে। এ শাখা সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাসের উপর জমে রয়েছে। এ বিশ্বাসের উপর ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যে সমালোচনাই বর্ষণ করা হোক এবং একে ইসলাম থেকে যে পরিমাণ দূরবর্তীই মনে করা হোক, তা যথার্থ। তবে এ কথায় কোন সন্দেহ নেই, এরা এক সুস্পষ্ট চিন্তাধারা গ্রহণ করেছে এবং কোন সন্দেহ নেই, তারা মির্যা সাহেবের চিন্তাধারার সঠিক প্রতিনিধিত্ব এবং মির্যা সাহেবের শিক্ষা ও আদর্শের যথাযথ প্রতিধ্বনি করছে।

কিন্তু লাহোরী শাখার ভূমিকা (যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব) খুবই আশ্চর্যজনক এবং বোধের অগম্য। মির্যা সাহেবের রচনাবলী অধ্যয়নকারী সুস্পষ্টভাবে দেখে, তিনি খোলাখুলিভাবে নবুয়তের দাবীদার আর যারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে, তাদের তিনি কাফের মনে করেন। যদি শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে থাকে এবং ভাষা ও ভাষাভাষীর কথা এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তমূলক কথা হয়ে থাকে এবং যদি এটা সত্য হয়ে থাকে, মির্যা সাহেব এ গ্রন্থগুলো দেশের ভাষায় সর্বসাধারণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে লেখে থাকেন, তবে এতে কোন সন্দেহ অবশিষ্ট নেই, নিজের গ্রন্থে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলছেন :

'আমি নবী, আমার কাছে ওহী আসে আমি আদেশ নিষেধের মালিক, আমি সাহেবে শরীয়ত, আমাকে যে অস্বীকার করবে সে কাফের জাহান্নামী।'

কিন্তু মৌলবী মুহাম্মদ আলী মির্যা সাহেবের প্রতি খোদ মির্যা সাহেব ও তার পুত্র থেকেও বেশি সহানুভূতিশীল। মুহাম্মদ আলী সাহেব নিজের বিশ্বাসে মির্যা সাহেবের সম্মান, দীনী কীর্তি ও খেদমতের ইজ্জত বাঁচাতে চান। মূলত তিনি সচেতন ও অবচেতনভাবে নিজের আত্মিক সম্পর্ক ও দীনী বিশ্বাস হেফাজত করতে এবং নিজের রূহকে ওই আঘাতের ব্যাথা থেকে বাঁচাতে চান, যা মির্যা সাহেবের নবুয়তের দাবী ও সাধারণ মুসলমানকে কাফের বলা দ্বারা পৌছেছে। তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, মির্যা সাহেব কোথাও পারিভাষিক নবুয়তের দাবী করেননি এবং মির্যা সাহেব যেখানে যেখানে নবুয়ত, ওহী, কুফর ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা শুধু সাধকদের পরিভাষা এবং রূপক মাত্র। আর এ কথা সত্য, প্রচলিত ও মশহুর দীনী পরিভাষাকে তাসাউফের ইশারা ও রূপকাশ্রিত প্রমাণ করার পর প্রত্যেক লেখকের কথা ও লেখাও বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। অতঃপর কোন জিনিসেরই প্রমাণ সম্ভব নয়।

মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব মির্যা সাহেবকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদে আজম ও শ্রেষ্ঠ সংস্কারক এবং এর থেকেও সামনে অগ্রসর হয়ে মসীহ মওউদ মানেন। এ বিন্দুতে এসে উভয় শাখার সম্মিলন হয়ে যায়। তাঁর তাফসীরে মির্যা সাহেবের মসীহ মওউদ হওয়ার ইংগিত বর্তমান রয়েছে। সূরা বাকারার আয়াত 'ওরা রাসূলান ইলা বানী ইসরাঈলা'-এর তাফসীর করে তিনি লিখেন :

"মুহাম্মদ (সা.)– যিনি সকল মানুষের দিকে প্রেরিত হয়েছেন এবং যাঁর নবুয়তের সময়কাল কেয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ– এমতাবস্থায় অন্য কোন রাসূল বা নবীর দিকে নিজেকে মুখাপেক্ষী মনে করা এ বৃহত্তর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং হাদীছ শরীফে ইবনে মারইয়ামের আগমনের যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, এর অর্থ শুধু এ-ই হতে পারে, এ উম্মতের মাঝ থেকে কোন ব্যক্তি ইবনে মারইয়ামের রঙে আসবেন। যেমন ইলইয়াসের দ্বিতীয়বার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে পূর্ণ হয়েছে, হযরত ইয়াহইয়া ইলইয়াসের রঙে এসে গেছেন। কুরআন করীমের এ সুস্পষ্ট কথা উম্মতে মুহাম্মদিয়ায় হযরত ঈসার আগমনকে বাধা প্রদান করে।"[১]

---

১. তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ-৩১৭

তিনি নিজের রচনায় মির্যা সাহেবের জন্য মৌলভী মুহাম্মদ আলী লাখোরী সাধারণভাবে 'মসীহ মওউদের' উপাধি ব্যবহার করেছেন।[২] এখানে তাঁর এ বিশ্বাসের পরিবর্তে তাঁর তাফসীরের উপর সমালোচনামূলক একটি দৃষ্টি ফেরানো হবে। আর এটা দেখা হবে, এর দ্বারা কিসের সন্ধান পাওয়া যায় এবং কি ধরনের দীনী চেতনা ও দীনী উপলব্ধি সৃষ্টি করে।

'তাফসীরে বয়ানুল কুরআন'

এরূপ মনে হয়, মৌলবী মুহাম্মদ আলী লাহোরীর মনন স্যার সৈয়দের সাহিত্য, তাঁর তাফসীরে কুরআনের পদ্ধতি এবং তাঁর চিন্তাধারা পূর্ণরূপে আত্তীকৃত করে ফেলেছিল। মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেবের দরসে তাফসীর ও সাহচর্য এ চেতনার চারাগাছে শক্তি সঞ্চয় এবং পানি সিঞ্চন করে। তিনি এ শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের উত্তম প্রতিনিধি, যাদের নতুন যুগের সামনে কুরআন পেশ করার ও আধুনিক শিক্ষিতদের মাঝে এর প্রচার প্রসার ঘটাবার বড় আগ্রহ, কিন্তু তাদের মন মস্তিষ্কের অবস্থান ও অতীতের তালীম তরবিয়ত গায়েবী বিষয়াবলী এবং অদৃশ্যলোকের ঘটনাবলী গ্রহণ করতে অক্ষম। তারা সাইন্স ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণা বা (সঠিক শব্দে) মশহুর মাসায়েল স্বীকৃত সত্যের ন্যায় গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং এগুলোর কোন কিছু (চাই ধর্মীয় শিক্ষা এবং আসমানী গ্রন্থের বিষয়ই হোক) গ্রহণ ও বর্জন করার জন্য মাপকাঠি মনে করেছেন। মূলত তাদের মন ও কালচার মু'জেযা এবং অস্বাভাবিক কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, কিন্তু তারা নিজের বংশীয় দীনী সম্পর্কের কারণে কুরআন মজীদ ও ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ থেকেও হাত গুটাতে পারছেন না। এ জন্য তারা মাঝামাঝি এ পথ বের করেছেন, ওইসব গায়েবী বিষয়াবলী, মু'জেযা ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা এমনভাবে করা হবে যেন আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে যেন তার সংঘর্ষ সৃষ্টি না হয় এবং এগুলো মেনে নেওয়ার ব্যাপারে মনের উপর যেন অপ্রয়োজনীয় কোন চাপ না পড়ে। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ওরা আয়াতে কুরআনীর তাফসীর ও তা'বীলে সব ধরনের কষ্ট স্বীকার এবং বাহ্যিকতা করতে প্রস্তুত থাকেন। আর সব দুর্বল থেকে দুর্বলতর বস্তুর আশ্রয়

২. উদাহরণস্বরূপ শুধু 'আননবুয়্যত ফিল ইসলাম' ও রদ্দে তাকফীরে আহলে কেবলা' দেখা যেতে পারে।

নিতেও তাদের কোন আপত্তি নেই। তারা নিজেদের এই তা'বীল ও ব্যাখ্যায় উসুলে তাফসীর, ভাষা ও সাহিত্যের নিয়মাবলী, পরিভাষা ও ব্যবহার, কুরআনের প্রথম শ্রবণকারী ও ভাষাভাষীদের উপলব্ধি, পূর্বসূরীদের তাফসীর, এক কথায় এ পথে যা প্রতিবন্ধক হবে এবং কুরআন মজীদ ও আধুনিক জ্ঞানের মাঝে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে যা বাধার সৃষ্টি করবে, তা থেকে হাত গুটাতে প্রস্তুত। স্যার সৈয়দ মরহুমের বৃহৎ তাফসীর এবং মৌলবী মুহাম্মদ আলী লাহোরীর তাফসীরী টীকা ও ফুটনোট এ ধরনের তাফসীরের উত্তম নমুনা। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

১. সূরা বাকারায় বলা হয়েছে : যখন হযরত মূসা (আ.) নিজের সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের জন্য পানি প্রার্থনা করেছিলেন, তখন এরশাদ হয়েছে, স্বীয় লাঠি পাথরের উপর মারো। অতঃপর এ কাজ করার ফলে কুদরতীভাবে বারটি প্রস্রবণ ফুটে বের হলো এবং বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র পরিতৃপ্ত হয়ে নিজেদের পিপাসা দূর করেছিল।

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ما قَدْعَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ (البقرة-٢)

আয়াতের এ তাফসীরের ভিত্তিতে, যা আরবী শব্দ দ্বারা বুঝা যায় এবং রাসূলের যমানা থেকে আজ পর্যন্ত যা করা হচ্ছে, এর দ্বারা এ কথা মানতে হচ্ছে, বনী ইসরাঈলের জন্য পাথর থেকে পানির প্রস্রবণ সাধারণ নিয়মের উর্ধ্বে অস্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। যেহেতু এ ব্যাপারে প্রাত্যহিক স্বাভাবিক দেখাশোনা ও সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত, এ জন্য এ জাহেরী অর্থ বর্জন করে মৌলবী মুহাম্মদ আলী 'আঘাত করা' ও 'লাঠি'র ওই অর্থ বর্ণনা করেছেন, যা আরবী ভাষায় নির্দিষ্ট ব্যবহার ও নির্দিষ্ট পরিভাষায় রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ضَرَبَ فِى الْاَرْضِ এর অর্থ যমীনের উপর চলা এবং عَصَا দ্বারা অর্থ হলো একত্রিত হওয়া, জামাতবন্দী হওয়া। অতঃপর শব্দের এ রূপক অর্থের সাহায্যে আয়াতের তর্জমা এই করেছেন, "নিজের জামাতের সাথে পাহাড়ের উপর চলে যাও।" আর এর ব্যাখ্যা এ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা

হযরত মূসা (আ.)-কে কোন পাহাড়ে চলে যাওয়ার হেদায়েত করেছেন, যেখানে তাঁর বারটি প্রস্রবণ মিলে যায়।[৩] সব পরোক্ষ অর্থ তিনি এ জন্য পছন্দ করেছেন, যাতে মুজেযা ও অস্বাভাবিক ঘটনা মানা থেকে এবং এর প্রমাণ পেশ করা থেকে বেঁচে যেতে পারেন আর তাঁর পাঠকদের অন্তরে ঈমান বিল গায়েব ও মুজেযা মানার বোঝা না পড়ে।

২. ওই সূরার-ই আয়াত :

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَئْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

–'স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে, তোমরা যা গোপন রাখছিলে আল্লাহ তা ব্যক্ত করছেন। আমি বললাম, এর কোন অংশ দ্বারা ওকে আঘাত কর, এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁর নিদর্শন তোমাদের দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।'– (বাকারাঃ ৭২-৭৩)

এ আয়াতের প্রসিদ্ধ অর্থ ও সাধারণ তাফসীর হচ্ছে, বনী ইসরাঈলের মাঝে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছিল। হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম, এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছ থেকে জানার জন্য নিবেদন করে। এর পূর্বে পরীক্ষামূলকভাবে তাদের একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আর তারা বহু অসৌজন্যমূলক কথা ও কাজ করার পর এ নির্দেশ পালন করেছিল। আল্লাহ তায়ালা হুকমে এলাহীর উপকারিতা ও এ নির্দেশ পালনের ফায়দা বাতলে দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এ গাভীটির-ই এক টুকরা নিহত ব্যক্তির শরীরে স্পর্শ করাও, সে নিজের হন্তার নাম বলে দেবে। বনী ইসরাঈলকে আহকামে এলাহীর মর্যাদা এবং তা মানার বরকত ও উপকারিতা বুঝানোর জন্য এ পন্থা খুবই উপযুক্ত ছিল। একজন নিরপেক্ষ মানসিকতার মানুষ আয়াতের অগ্র পশ্চাত দ্বারা এ-ই বুঝবে, কিন্তু যেহেতু এখানে কয়েকটি অস্বাভাবিক ঘটনা মানতে হয়, এ

৩. বয়ানুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৯, ৭০

জন্য মৌলবী মুহাম্মদ আলী এর সম্পূর্ণ ভিন্ন তাফসীর বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেছেন :

"সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ বলে এ শব্দগুলোতে কোন নবীর হত্যার উল্লেখ রয়েছে। অন্যদিকে এটাও সুস্পষ্ট, ওই নবী– যার হত্যার ব্যাপারে মতবিরোধে হয়েছে এবং সাফল্য অর্জন করা যায়নি, তিনি মসীহ (আ.)। সুতরাং এখানে ইহুদী সম্প্রদায়ের সীমা লংঘনের চিত্র আঁকা হয়েছে। একদিকে তো গাভী পর্যন্ত জবাই করতে এই পরিমাণে দ্বিধা-সংকোচ, অন্যদিকে একজন মর্যাদাসম্পন্ন নবীকে হত্যা করতে এতটুকু ভয়হীনতা। রয়ে গেল এ প্রশ্ন, فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا দ্বারা উদ্দেশ্য কি? اِضْرِبُوْهُ-এর মধ্য ضَمِيْر নফসের দিকে ফিরেছে। কেননা কখনো কখনো নফস এর যমীর অর্থের হিসেবে মুজাক্কার ব্যবহৃত হয়। আর بَعْضِهَا-এর যমীর ফিরেছে, 'কতল' ক্রিয়ার দিকে। অর্থাৎ আংশিক কতল দ্বারা তাকে মেরে ফেলো বা 'কতল' ক্রিয়া তার উপর পূর্ণভাবে পতিত হতে দিও না। আর এটা সত্য, হযরত মসীহের উপর 'কতল' পূর্ণভাবে পতিত হয়নি, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তিনি মাত্র তিন ঘন্টা ছিলেন। এত অল্প সময়ে কোন ব্যক্তি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরতে পারে না। তাঁর সাথে যে চোরকে শূলে চড়ানো হয়েছিল তার হাড় ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল; তবে তাঁর হাড় ভাঙ্গা হয়নি। এটাই كَذٰلِكَ يُحْيِى اللّٰهُ الْمَوْتٰى আর فَاضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا দ্বারা বলা হয়েছে : যাকে তোমরা মৃত ধারণা করে বসেছ, তাকে আল্লাহ তায়ালা এভাবে জীবিত রেখেছেন।"[৪]

আয়াতের এ তাফসীর পূর্বে বর্ণিত মানসিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একটি মুজেযার ঘটনা থেকে বাঁচার জন্য কিভাবে ছল চাতুরীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কিভাবে মোয়ান্নাছ(স্ত্রীলিঙ্গ)-এর যমীর দ্বারা মোজাক্কার (পুংলিঙ্গ) এবং মোজাক্কারের যমীর দ্বারা মোয়ান্নাছ বুঝানো হয়েছে। আর এ আয়াতগুলো অগ্র পশ্চাতের সম্পূর্ণ বিপরীত হযরত মসীহের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

৩. কুরআন শরীফে হযরত মসীহ (আ.)-এর এই কথাটা বার বার এসেছে– "আমি মুজেযা ও নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ তোমাদের সামনে মাটি দ্বারা জানোয়ার বানাচ্ছি, অতঃপর এগুলোতে ফুঁক দিয়ে হাওয়ায় পাখির ন্যায় উড়িয়ে দেই।"

---

৪. খণ্ড ১, পৃ-৭৯

اِنِّىٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ (ال عمران-۴۹)

এখানে প্রাণহীন বস্তুর মাঝে রূহ দেওয়ার মুজেযা থেকে বাঁচার জন্য মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব এ আয়াত রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি লেখেছেন :

"রূপকভাবে এখানে طير দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই সব মানুষ যারা মাটি ও মাটির বস্তু থেকে উপরে উঠে আল্লাহর দিকে আরোহণ করে। আর এ কথা সহজেই বুঝা যায়, কিভাবে নবীর ফুঁক দ্বারা মানুষ এ ধরনের উপযুক্ত হয়ে যায় যে, সে যমীনের খেয়াল বর্জন করে আধ্যাত্মিকতায় আরোহণ করে।"[৫]

৪. সূরা 'আন্‌নামলে' এসেছে : হযরত সুলায়মান (আ :) নেয়ামতের শোকর আদায় করতে গিয়ে বলেছেন–

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ

–"হে মানুষ, আমাকে বিহংগকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সকল কিছু থেকে দেওয়া হয়েছে।"– (নামল : ১৬)

যেহেতু কোন মানুষের পক্ষে পাখ-পাখালির কথা বুঝা স্বভাববিরুদ্ধ, তাই মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব এর দ্বারা চিঠিপত্র আদান-প্রদান অর্থ করেছেন। তিনি লিখেন :

"রাজ্যের মাল আসবাবের মধ্যে বিশেষ করে পূর্ববর্তী যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা পাখির মাধ্যমে নেওয়া হত, তা হলো চিঠিপত্র আদান প্রদানের কাজ। সুতরাং ওই চিঠি যা পাখি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়, রূপকভাবে তাকে مَنْطِقَ الطَّيْرِ বলা হবে।"[৬]

এর পরবর্তী আয়াত–

حَتّٰىٓ اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ

৫. খণ্ড-১, পৃ-৩২১

৬. খণ্ড -৩, পৃ-১৪০৯

এর মধ্যে وَادِى النَّمْلِ দ্বারা (প্রসিদ্ধ তাফসীর ও প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী) অর্থ পিঁপড়াদের গ্রাম নয়; বরং তাঁর নিকট এর অর্থ এটা বনী নামলাহ নামক একটি আরব গোত্রের ময়দান। আর 'নামলাহ' সেই গোত্রেরই একজন সদস্য। তিনি লিখেন :

"এটা কোনো সম্প্রদায় ছিল, যাদের এ কথা জানা হয়েছে, হযরত সুলায়মান নিজের বাহিনীর সাথে আসছেন, তখন ওরা বলেছে, এরূপ যেন না হয়, আমরা অযথা শত্রু মনে হয়ে মারা যাই।[৭]

৫. সূরা সাবা'য় হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ব্যাপারে এরশাদ হয়েছে :

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ج

–'যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন জিনদের তার মৃত্যুর বিষয় জানাল কেবল মাটির পোকা, যা সুলায়মানের লাঠি খাচ্ছিল।– (সাবা : ১৪)

মুফাসসেরীনে কেরাম এর তাফসীরে লিখেন : হযরত সুলায়মান (আ.) জিনদের দিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনর্নির্মাণ করাচ্ছিলেন। যখন তিনি জানলেন, তাঁর মউত এসে গেছে, তখন জিনদের এক নকশা দেখিয়ে দিয়ে তিনি কাঁচের নির্মিত একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে যান। এ অবস্থাতেই ফেরেশতা এসে তাঁর রূহ উঠিয়ে নেন। তাঁর লাশ মুবারক কাষ্ঠখণ্ডের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো থাকে। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ কেউ জানতে পারেনি। মৃত্যুর পর অনেক দিন যাবত জিনেরা যথারীতি নির্মাণ কাজ চালিয়ে যায়। যখন নির্মাণ কাজ পূর্ণ হয়ে যায়, যে লাঠির উপর তাঁর লাশ ভর দেওয়া ছিল, ঘুণে খাওয়ার কারণে সে লাঠিটি পড়ে যায়। তখন তাঁর মৃত্যুর সংবাদ সকলের জানা হয়। এর দ্বারা জিনদের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার রহস্য খুলে যায়। আর তাঁর ভক্ত মানুষদেরও জানা হয়ে যায় : যদি জিনদের অদৃশ্যের সংবাদ জানা থাকত তবে কি তারা এ লাঞ্ছনাদায়ক কষ্টে পড়ে থাকত?[৮]

---

৭. খণ্ড-৩, পৃ-১৪১১

৮. মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওছমানী (রহ.) কৃত টীকা

এখানেও যেহেতু কয়েকটি অস্বাভাবিক ঘটনা মেনে নিতে হয়, তাই মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব دَابَّةُ الْأَرْضِ এবং مِنْسَأَةَ-এর সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করে লেখেছেন :

"মূল কথা হলো, হযরত সুলায়মানের ওফাতের পর পরই এ রাজ্যের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। হযরত সুলায়মানের ছেলে রজীআম-এর ক্ষমতায় আরোহণ করার কিছুদিন পর ইয়ারব্আম কর্তৃক উত্তেজিত করার কারণে বনী ইসরাঈল কিছু দাবী দাওয়া পেশ করে। এ সময় হযরত সুলায়মানের পুরনো পরামর্শদাতারা রজীআমকে পরামর্শ দেয়, সে যেন কওমকে কষ্ট না দেয় এবং তাদের দাবী দাওয়া মেনে নেয়, কিন্তু সে পরামর্শদাতাদের কথা শোনার পরিবর্তে নিজের নওজোয়ান সাথীদের কথার ভিত্তিতে বনী ইসরাঈলের দাবী দাওয়ার কঠোরভাবে জওয়াব দেয় এবং তাদের উপর কঠোর ব্যবহার করতে শুরু করে। যার ফলে দশটি সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং হযরত সুলায়মানের রাজ্য বরবাদ হয়ে যায়। আর রজীআমের হুকুমত শুধু ছোট একটি শাখায় অবশিষ্ট থাকে। এর পরিণতি এ দাঁড়ায়, ইসরাঈলী ছাড়া অন্য জাতিগুলোও স্বাধীন হয়ে যায়। (দ্র : সালাতীন, অধ্যায়-১২)

অতএব 'দাব্বাতুল আরদ' হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পুত্র এই রজীআম, যার দৃষ্টি শুধু যমীনেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সুলায়মান (আ.)-এর লাঠি ঘুণে খাওয়া তার রাজ্যের ধ্বংস হওয়া। আর জিন দ্বারা অর্থ হলো অন্য সম্প্রদায়, যারা তখন পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের আয়ত্তে ছিল।[৯]

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ.৬

সুলায়মান বিহংগদলের সন্ধান নিলেন এবং বললেন, 'ব্যাপার কি, হুদহুদকে দেখছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি? (নামল : ২০)

আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সকলেই 'হুদহুদ' দ্বারা বিশেষ ধরনের পাখি বুঝেছেন, আর আয়াতের অগ্র পশ্চাতও এটাই বলে। কেননা, উপরে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পাখিদের ভাষা সম্পর্কে অবগত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। আর এ স্থানে পাখিদেরই হিসাব নিচ্ছেন "وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ", কিন্তু যেহেতু এ

৯. খণ্ড-৩, পৃ-১৫৩৬

ঘটনায় একটি অস্বভাবিক নিয়মের উল্টো কথা রয়েছে, তা হলো পাখিদের সাথে কোন মানুষ কথাবার্তা বলবে এবং তাদের হিসাব নেবে, আর ওরা নিজেদের কর্মকাণ্ডের কথা বর্ণনা করবে, এ জন্য মৌলবী মুহাম্মদ আলীর কাছে 'হুদহুদ' দ্বারা অর্থ হল : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সংবাদ আদান প্রদানের বড় অফিসার বা সি.আই.ডি পুলিশের ইনসপেক্টর জেনারেল। তিনি লিখেছেন :

"হুদহুদ কোনো ব্যক্তির নাম, যে সংবাদ পৌছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। হিসাব নেওয়ার সময় যার উপস্থিতি একান্ত জরুরী ছিল। কেননা, পাখিদের দ্বারা সংবাদ পৌছানোর কাজ-ই করা হত। অতএব হযরত সুলায়মান যখন পাখিদের ডাকলেন, আলাইহিস সালাম, তখন তিনি এ বিষয়ের বড় অফিসারকে অনুপস্থিত পেলেন। তখনই বললেন, হুদহুদ কোথায়? পাখী এবং পশুদের নাম দ্বারা সাধারণত মানুষের নাম রাখা হয়। ফকস (খেঁকশিয়াল), ওল্‌ফ (বাঘ) ইত্যাদি নাম এখন সভ্য জাতিও রাখে। হিন্দুদের মাঝে 'তোতারাম' মুসলমানদের মাঝে ' শের' এবং 'বায' বরং 'শেরবায' সাধারণ নামে পরিণত হয়ে গেছে। আরবেও এ ধরনের নাম রাখা হয়। যেমন– 'আসাদ' ইত্যাদি।"[১০]

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا

–"বল, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।"– (জিন :-১)

এখানে জিন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তায়ালার ওই সৃষ্টজীব, যারা সাধারণত অদৃশ্য অবস্থায় থাকে। কুরআন, হাদীছ, ঐকম্যত ও পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা যা প্রমাণিত। মুফাসসেরগণের মতে এ আয়াত দ্বারা একটি ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে। ঘটনাটি হলো, নবী করীম (সা.) একবার ফজরের সালাতে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করছিলেন। কয়েকটি জিন এদিক দিয়ে যাচ্ছিল

---

১০. খণ্ড-৩, পৃ-১৪১৩

এবং কুরআনের আওয়াযে আকৃষ্ট হয়ে একনিষ্ঠতার সাথে ঈমান গ্রহণ করে অতঃপর নিজের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণনা করে।[১১]

কিন্তু মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব আরবী ভাষা, ব্যাকরণিক নিয়ম ও প্রসিদ্ধ তাফসীরের সম্পূর্ণ উল্টো 'জিন' দ্বারা ঈসায়ী সম্প্রদায় অর্থ গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেন :

"জিন দ্বারা মানুষকে-ই বুঝানো হয়েছে। যেহেতু এরা বাইরের মানুষ ছিল, যারা আরববাসীদের দৃষ্টি থেকে লুক্কায়িত থাকত, এ জন্য তাদের জিন বলা হয়। আর এ জিনেরা ছিল ঈসায়ী।"

সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি লিখেন :

"সম্ভবত এসব আলোচনা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে, ঈসায়ী সম্প্রদায়, যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে কখনো জিনের মর্যাদা অর্জন করে ফেলবে, শেষ পর্যন্ত তাদের একটি অংশ কুরআন শরীফের সত্যতার উপর ঈমান আনয়ন করবে।"[১২]

এখানে আমরা এই কয়টি নমুনা পেশ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি। অন্যথায় এ তাফসীর, যা তিনটি বৃহৎ খণ্ড সম্বলিত, এ ধরনের আজগুবি তাফসীর দ্বারা পরিপূর্ণ।

এখানে একজন সুস্থ মানুষের মনে সহসা এ প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, সাহবায়ে কেরাম, যাঁরা কুরআন শরীফের প্রথম শ্রোতা ছিলেন, যাঁদের ভাষায় কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছিল, রাসূলের সাহচর্যে যাঁরা কুরআন মজীদের সঠিক অর্থ হাসিল করেছিলেন, তাঁরা কি এ আয়াতগুলো দ্বারা এ অর্থই বুঝতেন? তাঁরাও কি اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ দ্বারা দলবল নিয়ে পাহাড়ে যাওয়ার অর্থ বুঝেছেন?

فَاضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا-এর অর্থ তাদের নিকট কি এটাই ছিল যে, হযরত মসীহ (আ.)-এর উপর হত্যা ক্রিয়া পূর্ণ হতে দিও না।

طَيْر দ্বারা অর্থ কি সেই পবিত্র আত্মাসমূহ যারা মাটি ও মাটির বস্তু থেকে ঊর্ধ্বে উঠে আল্লাহর দিকে আরোহণ করে। مَنْطِقَ الطَّيْرِ-এর অর্থ কি চিঠি

---

১১. মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওছমানী (রহ.) কৃত টীকা

১২. খণ্ড-৩, পৃ-১৮৯৩

আদান প্রদানকারী কবুতর? وَادِى النَّمْلِ দ্বারা কি কোন গোত্রের আবাসস্থল বুঝানো হয়েছে? دَابَّةُ الْاَرْضِ-এর অর্থ কি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পুত্র রজীআম, যার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল শুধু যমীনের দিকে? هُدْ هُدْ দ্বারা কি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সংবাদ আদান প্রদান বিভাগের বড় অফিসার বুঝানো হয়েছে? সূরা জিন-এর 'জিন' শব্দের অর্থ কি ইউরোপের ঈসায়ী সম্প্রদায়?

এমনিভাবে তাবেঈন ও তাঁদের পরবর্তী ভাষাবিদ, ওলামা ও মুফাসসেরদের মাঝ থেকে কেউ কি এ আয়াত ও শব্দগুলোর এ অর্থ বুঝেছিলেন? ইতিবাচক উত্তর দেওয়া তো অসম্ভব। কেননা, পূর্ববর্তীগণের প্রণীত তাফসীর তো আমাদের সামনেই রয়েছে। সেগুলোর কোথাও এর অস্তিত্ব নেই। খোদ এ যমানার আরবী ভাষাভাষী এবং সাহিত্যিকদের মনও এ অর্থের দিকে যেতে পারে না। যদি ঘটনা এমনি হয়, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার তেরশ' বছর পর অনারব এক ব্যক্তির মনে প্রথম বার এ অর্থ এসেছে, তবে কুরআন মজীদ যে স্থানে স্থানে নিজের জন্য "اَلْكِتَابُ الْمُبِيْنُ" (সুস্পষ্ট কিতাব), "عَرَبِيٌّ مُبِيْنٌ" (সুস্পষ্ট আরবী ভাষা) ইত্যাকার শব্দ ব্যবহার করেছে, এর কি অর্থ? সূরা শু'আরা'য় এরশাদ হয়েছে :

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ (الشعراء١٩٣-١٩٥)

"জিবরাঈল এ নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারজ্জ অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।"

(শু'আরা : ১৯৩-১৯৫)

الٓرٰ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

–"আলিফ-লাম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। তা আমি অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।"–(ইউসুফ : ১.২)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?" (কামার : ২২)

এর অর্থ তো এ দাঁড়ায়, কুরআন মজীদের আয়াত তেরশ' বছর পর্যন্ত হেঁয়ালী এবং প্রহেলিকায় পরিণত হয়ে রয়েছিল এবং এর হেদায়েত তেরশ' বছর পর থেকে শুরু হলো। শব্দের প্রকাশ্য এবং বহুল প্রচলিত অর্থ, আরবী ভাষার নিয়ম ও নীতিমালা, কুরআনের প্রথম সময়কার শ্রোতাদের উপলব্ধি, আয়াতের অগ্র পশ্চাত ও সহীহ হাদীছ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কুরআন মজীদের তাফসীর করা কুরআন মজীদের অর্থগত বিকৃতি সাধন এবং কুরআনের সাথে কৌতুক কর– যা নাস্তিকতার দরজা খুলে দেয় এবং কালামে এলাহীকে ছেলেদের খেলনায় রূপান্তরিত করে দেয়। আর এটা উম্মতের সর্বোত্তম সদস্যদের এবং মহোত্তম যুগের অজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রমাণ বহন করে। বহু দিন আগে মির্যা গোলাম আহমদ স্যার সৈয়দের তাফসীরের সমালোচনা লেখেছিলেন। মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবের তাফসীরের উপর এর চেয়ে উত্তম সমালোচনা সম্ভব নয়।

"কুরআন কারীমের যে সব জটিল ব্যাখ্যা না আল্লাহ তায়ালার এলেমে ছিল, না তাঁর রাসূলের এলেমে, না সাহাবাদের এলেমে, না আওলিয়া, কুতুব, গাউছ আবদালের এলেমে, না এগুলোর উপর দালালত করে দালালতুন্নস, -তা-ই সৈয়দ সাহেবের বোধগম্য হয়েছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলিম জাহানকে কী দিয়েছে?

এখন যখন আমি এ রহস্য সন্ধানের সফরের সর্বশেষ মনযিলে পৌছে গেছি এবং এ গ্রন্থের শেষ ছত্রগুলো লিখছি, তখন কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা আমার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে করা উচিত। আর এ-ও দেখা উচিত, এ সম্প্রদায় ইসলামের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে কি কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছে এবং মুসলিম জাহানের নতুন প্রজন্মকে কি দান করেছে? অর্ধ শতকের এ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়ের ফল কি দাঁড়িয়েছে? এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ইসলামী মাসায়েল ও বিরোধপূর্ণ বিষয়ে যে এক ব্যাপক ও বৃহত্তর গ্রন্থাগার[১] স্মরণীয় করে রেখে গেছেন এবং যা মোটামুটি সত্তর বছর যাবত আলোচ্য বিষয় হয়ে রয়েছে, এর সারাৎসার কী? কাদিয়ানী সম্প্রদায় নতুন যুগের জন্য কি পয়গাম নিয়ে এসেছে?

এ সব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে প্রথমে আমাদের আলমে ইসলামীর যে প্রেক্ষিতে এ সম্প্রদায়ের উত্থান হয়েছিল সে প্রেক্ষিতে উপর দৃষ্টি ফেরানো উচিত। আর এ-ও দেখা উচিত, ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম জাহানের কী অবস্থা হয়েছিল এবং এর মৌলিক সমস্যা কি ছিল।

এ যুগের সবচেয়ে বড় ঘটনা, যা কোন ঐতিহাসিক বা কোন সংস্কারক উপেক্ষা করতে পারে না, তা হলো, এ সময়েই ইউরোপ আলমে ইসলাম, বিশেষ করে ভারতবর্ষের উপর হামলা চালায়। ওদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল, আল্লাহর পরিচয় থেকে তা ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। ওদের সভ্যতা ছিল নাস্তিকতা ও আত্মপূজায় পূর্ণ। ঈমান, এলেম ও জাগতিক শক্তিতে দুর্বল হওয়ার কারণে আলমে ইসলাম সহজেই পশ্চিমা অস্ত্র সজ্জিত শক্তির শিকারে পরিণত হয়ে যায়। ওই সময় ধর্ম (যার প্রতিনিধিত্বের জন্য শুধু ইসলাম-ই ময়দানে ছিল) এবং ইউরোপের নাস্তিক্য ও বস্তুবাদী সভ্যতার মাঝে মোকাবিলা হয়। এ

---

১. মির্যা সাহেবের রচনাবলীর সংখ্যা ৮৪ থেকে কম হবে না। এর মাঝে অধিকাংশই বৃহৎ ও কয়েক খণ্ডের গ্রন্থ।

মোকাবিলা এমন ধরনের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, এলমী ও সমষ্টিগত নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, যেগুলোর সমাধান সম্ভব ছিল শুধু শক্তিশালী ঈমান, মজবুত ও সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং গভীর জ্ঞানের মাধ্যমে। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছিল একজন জ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের যিনি আলমে ইসলামে জেহাদের স্পৃহা এবং মুসলমানের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করতে পারেন। যিনি ঈমানী শক্তি ও চতুর্মুখী যোগ্যতা দ্বারা দীন ইসলামের মূল শিক্ষা অক্ষুণ্ন রেখে, ইসলামের সার্বজনীন পয়গাম ও বর্তমান সময়ের অস্থির পৃথিবীর মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম এবং অনিষ্টকারী ও উদ্ধত পশ্চিমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেন।

অপর দিকে আলমে ইসলাম বিভিন্ন রকম দীনী ও চারিত্রিক রোগে ভুগছিল। তার চেহারায় সবচেয়ে বড় চিহ্ন ছিল সেই প্রকাশ্য শেরেকের, যা সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। অহরহ কবর পূজা চলছিল। গায়রুল্লাহর নামে প্রকাশ্যে দোহাই দেওয়া হত। ঘরে ঘরে বেদআতের চর্চা চলছিল। অশ্লীলতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এ পরিস্থিতি এমন একজন মোসলেহ বা সংস্কারকের কামনা করত, যিনি ইসলামী সমাজের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট জাহেলিয়াতের দুষ্ট জীবাণু দূর করতে পারবেন। যিনি পূর্ণ সাহসিকতার সাথে সুস্পষ্টভাবে তাওহীদ ও সুন্নতের দাওয়াত দিতে পারবেন এবং যিনি পারবেন পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে আলা- লিল্লাহি দ্দীনুল খালিস'এর স্লোগান ধ্বনিত করতে।

এর পাশাপাশি বস্তুবাদী সংস্কৃতির প্রভাবে মুসলমানদের মাঝে ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতা, হতাশা ও চারিত্রিক অধঃপতন পরিলক্ষিত হয়। চারিত্রিক অধঃপতন অশ্লীলতা পর্যন্ত, আরাম-আয়েশ আত্মপূজা পর্যন্ত, সরকার ও সরকারী আমলাদের অনুকরণপ্রিয়তা গোলামী পর্যন্ত এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি ও শাসকগোষ্ঠী (ইংরেজ)-এর অন্ধ অনুসরণ কুফর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। এ সময় প্রয়োজন ছিল এমন এক মোসলেহ-এর, যিনি ক্রমবর্ধমান এ চারিত্রিক অধোমুখিতায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারবেন।

শিক্ষাও একাডেমিক দিকে অবস্থা এরূপ ছিল, সাধারণ খেটে খাওয়া সমাজ দীনের প্রাথমিক জ্ঞান সম্বন্ধেও ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ শরীয়তে ইসলামী, ইসলামের ইতিহাস ও সোনালী অতীত সম্পর্কে ছিল অসচেতন এবং ইসলামের ভবিষ্যত সম্পর্কে ছিল হতাশার শিকার। ইসলামী

শিক্ষা ও পুরনো শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর ছিল মুমূর্ষু অবস্থা। এ সময় শক্তিশালী একটি শিক্ষা আন্দোলন এবং দাওয়াতের বড় প্রয়োজন ছিল। তখন নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, নতুন ও উন্নত মানের ইসলামী সাহিত্য এবং আধুনিক মানসম্পন্ন প্রকাশনা সংস্থার প্রয়োজন ছিল, উম্মতের সর্বশ্রেণীর মাঝে যা সৃষ্টি করতে পারে আত্মতৃপ্তি, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দীনী চেতনা।

এসব কিছু ছাড়া, আলমে ইসলামের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হলো : আম্বিয়া (আ.)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি অনুযায়ী ঈমান, আমল, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ইসলামী বিধান অনুসরণের দাওয়াত দেওয়ার। যার সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মহাসাফল্য, শত্রুদের উপর বিজয় ও দীন দুনিয়ার কামিয়াবীর। বস্তুত আলমে ইসলামের কোন নতুন দীনের প্রয়োজন ছিল না; প্রয়োজন ছিল নতুন ঈমানের। উম্মতে মুহাম্মদীর কখনো নতুন দীন বা নতুন পয়গম্বরের প্রয়োজন ছিল না। দীনের শাশ্বত বিশ্বাস ও চিরন্তন শিক্ষায় প্রয়োজন ছিল নতুনভাবে ঈমান আনা ও নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করার, যা দ্বারা যুগের ফেতনাগুলোর মোকাবিলা করা যায়।

উল্লিখিত প্রয়োজন পূরণের জন্য মুসলিম জাহানের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও জামাত সামনে এসেছে। যারা নতুন কোন দাবী ব্যতীত সময়ের প্রয়োজন ও যুগের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করেছেন এবং মুসলমানের একটা বিরাট সংখ্যাকে প্রভাবিত করেছেন। তারা নতুন কোন ধর্ম বা নতুন কোন নবুয়তের পতাকা উড্ডীন করেননি বা মুসলমানের মাঝে কোন বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি করেননি। তারা নিজেদের শক্তি ও যোগ্যতা নিষ্ফল কোন কাজে ব্যয় করেননি। তাদের কল্যাণ সব রকম ক্ষত থেকে মুক্ত, তাদের দাওয়াত ভয় থেকে পবিত্র এবং তাদের কাজ ছিল সব ধরনের সন্দেহের উর্ধ্বে। ইসলামী দুনিয়া তাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছে নিজেদের কিছু খোয়ানো ছাড়াই; আর মুসলিম সমাজ সর্বদা তাঁদের একনিষ্ঠ খেদমতের শোকরগোযার থাকবে।

এ ধরনের সংকটময় মুহূর্তে ভারতবর্ষের ন্যায় আলমে ইসলামের একটি সংকটপূর্ণ স্থানে মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব নিজের দাওয়াত ও আন্দোলন নিয়ে সামনে এলেন। জাতির সত্যিকার সমস্যা ও সময়ের চাহিদা পেছনে রেখে নিজের জ্ঞান ও কলমের সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন তিনি শুধুমাত্র একটি বিষয়ে। সে বিষয়টি কি? সে বিষয়টি হলো, "ওফাতে মসীহ ও মসীহ মওউদের দাবী।" এছাড়া আর যেটুকু সময় বাঁচে, তা ব্যয় করেন জেহাদ নিষিদ্ধের দাবী উঠিয়ে

ও তৎকালীন সরকারের আনুগত্যের আহবান জানিয়ে। শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ সময়ব্যাপী তাঁর রচনা, সাধনা ও পরিশ্রমের বিষয় এ একটি মাত্র মাসআলাই। যদি তার রচনাবলী থেকে হায়াতে মসীহ, নুযূলে মসীহ, তাঁর মসীহ মওউদ হওয়ার দাবী এবং এ বিষয় সম্পর্কিত পার্শ্ব আলোচনা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেগুলোর কোন গুরুত্বই আর অবশিষ্ট থাকে না।

এখানে আরও লক্ষ্য করার বিষয়, অনেক দিন থেকেই মুসলিম জাতির মাঝে ধর্মীয় কোন্দল ও অন্তর্দ্বন্দ্ব চলে আসছিল, তখন নতুন কোন দ্বন্দ্ব সংঘাত বরদাশত করার শক্তি তার ছিল না, ঠিক এমনি মুহূর্তে তিনি নবুয়তের পতাকা উত্তোলন করছেন, আর যারা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে তাদের তিনি কাফের আখ্যা দিচ্ছেন। এভাবে তিনি নিজের ও মুসলমানদের মাঝে দূরতিক্রম্য একটি শিশাঢালা প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। যার একদিকে তাঁর অনুসারীদের ছোট্ট একটি দল, অপর দিকে রয়েছে মরক্কো থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত পুরো আলমে ইসলাম। এমনিভাবে তিনি মুসলিম জগতে নতুন একটি বিশৃঙ্খলা ও বিভাজন সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা মুসলমানদের সমস্যাগুলোর মাঝে সমস্যার সংযোজন করেছে মাত্র।

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব মূলত ইসলামের এলমী ও দীনী ভাণ্ডারে নতুন এমন কিছু দান করেননি, যার জন্য এসলাহ বা সংস্কারের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এবং মুসলমানের নতুন প্রজন্ম তাঁর শোকরগোযার হয়ে থাকবে। তিনি এমন কোন সর্ববিস্তারী দীনী খেদমত আঞ্জাম দেননি, যার কল্যাণ দুনিয়ার সকল মুসলমানের মাঝে পৌঁছেছে। তাছাড়া তিনি সময়ের নতুন সমস্যাগুলোর মাঝে কোনোটির সমাধানও দিতে পারেননি। তাঁর আন্দোলন সমকালীন মানব সভ্যতার জন্য– জীবন মৃত্যুর টানাপড়েনে যা বিধ্বস্ত হচ্ছে নতুন কোন পয়গাম নিয়েও আসেনি। তিনি ইউরোপ ও ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার প্রসারে উল্লেখযোগ্য কোন কীর্তিও আঞ্জাম দেননি। তাঁর চেষ্টা ও পরিশ্রমের ময়দান ছিল মুসলমানদের ভেতর। যার ফলে মুসলিম সমাজে সৃষ্টি হয়েছে অযাচিত বিশৃঙ্খলা ও অনাকাঙ্ক্ষিত ধর্মীয় কোন্দল। কোন বিষয়ে যদি তাঁকে সফলকাম বলা যায়; তবে শুধু এ বিষয়ে যে, তিনি নিজের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য স্যার আগা খানের উত্তরাধিকারীদের ন্যায় নেতৃত্বের একটি মসনদ ও একটি দীনী জমিদারী সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ও দুনিয়াবী ভোগ বিলাস হাসিল হয়েছে।

মূল কথা হল, যদি হিন্দুস্তানে এ অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার ভাব না হত (পাঞ্জাব ছিল যার বিশেষ ক্ষেত্র), যদি ইংরেজ শাসনের প্রভাবে ইসলামী সমাজে ইসলামের মূল বুনিয়াদগুলো পতনোন্মুখ হয়ে না পড়ত, যদি মুসলমানের নতুন প্রজন্ম দীনী শিক্ষায় এতটুকু অজ্ঞ না হত, সর্বশেষ যদি সমকালীন হুকুমতের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকত, তবে এ আন্দোলন– যার ভিত্তি হল এলহাম বা ঐশী নির্দেশ, স্বপ্ন ও মনগড়া ব্যাখ্যার উপর এবং যা নতুন যুগের জন্য নতুন কোন পয়গাম নিয়ে আসেনি, কখনো এতদিন পর্যন্ত টিকে থাকতে পারত না। যেমন থাকতে পেরেছে এই পতনোন্মুখ সোসাইটি, বিকৃত মস্তিষ্ক ও বিকৃত বোধসম্পন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে। ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা ও দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা এবং ওইসব নিষ্ঠাবান মুজাহিদদের (নিকট অতীতে যারা এ দেশে পয়দা হয়েছেন এবং ইসলামের উত্থান ও মুসলমানদের পুনরায় জাগ্রত করার জন্য নিজের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন।) কথায় কর্ণপাত না করার শাস্তি আল্লাহ তায়ালা এই দিয়েছেন, হিন্দুস্তানী মুসলমানদের উপর একটি সংক্রামক ব্যাধি চাপিয়ে দিয়েছেন এবং এমন ব্যক্তিকে তাদের মাঝে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি উম্মতের মাঝে বিচ্ছিন্নতার একটি স্বতন্ত্র বীজ বপন করে দিয়ে গেছে।

বছর দুই পূর্বের কথা। দামেশক ইউনিভার্সিটির ছাত্র শিক্ষকদের সামনে ইসলামের সংস্কার আন্দোলন শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে লেখক বাতেনী সম্প্রদায়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিল :

"হযরত, আমি যখন বাতেনী সম্প্রদায়, ইখওয়ানুস সফা, ইরানের বাহারঈ সম্প্রদায় ও হিন্দুস্তানের কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ইতিহাস পড়ি, তখন আমার এরূপ মনে হয়, এ সব মতবাদের স্থপতিগণ ইসলাম এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির ইতিহাস পড়ে দেখেছে : জাযীরাতুল আরবে একাই এক ব্যক্তি নতুন একটি দাওয়াত নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে না ছিল সম্পদ, না ছিল হাতিয়ার। তিনি নতুন এক বিশ্বাস ও নতুন এক দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন। এরপর অল্প দিনের মধ্যেই একটি নতুন উম্মত, একটি নতুন হুকুমত ও একটি সংস্কৃতি অস্তিত্বে এসে যায়। তিনি ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেন, ঘটনার স্রোতধারা বদলে দেন। এ দেখে উল্লেখিত সাম্প্রদায়গুলোর উচ্চভিলাষী মন তাদের বলেছে : মানসিক শক্তি ও সাংগঠনিক যোগ্যতা তাদের আছে, তবে কেন নতুন করে আবার ইতিহাস সৃষ্টি হবে না, কেন ওইসব ঘটনার আবার

প্রকাশ ঘটবে না, যেরূপ প্রকাশ ঘটেছিল ঈসায়ী ষষ্ঠ শতাব্দীতে। কেননা, মানুষের মাঝে সর্বদা সব আহবানে সাড়া দেওয়ার যোগ্যতা রয়েছে।

ওইসব উচ্চভিলাষী মানুষ এ একক সত্তাকে তো দেখেছে, যিনি কোন পুঁজি বা কোন সামরিক শক্তি ব্যতীত একটি দীনী দাওয়াত নিয়ে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু তাঁর পেছনে সে রব্বানী সহযোগিতা প্রত্যক্ষ করেনি, যার বদৌলতে অর্জিত হয়েছে এ মহা বিজয়, পরম সাফল্য ও কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকার ফয়সালা। যিনি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন :

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

'তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর একে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদি মোশরেকরা তা অপছন্দ করে।' (সাফ : ৯)

ফল এই দাঁড়িয়েছে, সাময়িকভাবে তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে এবং তারা হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ অনুসারী তৈরী করেছেন। এদের মধ্যে কেউ (বাতেনিয়া) আজীমুশশান (ফাতেমী) সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করেছে। আর এ সাম্রাজ্য অনেক দিন ধরে ফুলে ফলে ভরেও উঠেছিল। এক সময় যা সুদান থেকে মরক্কো পর্যন্ত কব্জা করে নিয়েছিল। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তাদের সংগঠন, গোপন যোগসাজশ এবং প্রতারণামূলক কলাকৌশল বাকি ছিল, তাদের উত্থানও বাকি ছিল, কিন্তু এর পর একদিন এমন সময় এল, এ সব উত্থান ও ক্ষমতা, এ সব উন্নতি অগ্রগতি রূপকথার গল্পে পরিণত হল। তাদের ধর্ম একটি সংক্ষিপ্ত গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে রইল, মানব জীবনে যার কোনো প্রভাব এবং দুনিয়ায় যার কোনো মর্যাদা বিদ্যমান রইল না।

এর বিপরীতে ইসলাম– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, আজো তা দুনিয়ার এক অতি বড় আধ্যাত্মিক শক্তি। আজ এর সাথে একটি মর্যাদাসম্পন্ন উম্মত বিদ্যমান। এর একটি নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। এটি আজ অনেক জাতি ও রাষ্ট্রের ধর্ম। নবুয়তে মুহাম্মদীর সূর্য আজো শক্তিশালী, উজ্জ্বল। ইতিহাসের কোনো যুগেই এ সূর্য রাহুগ্রস্ত হয়নি।[২]

---

২. তারীখে দাওয়াত ও আযীমত, ১ম খণ্ড

গ্রন্থপঞ্জি

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীসহ অপরাপর কাদিয়ানী লেখকদের যে সব বইয়ের উদ্ধৃতি বর্তমান গ্রন্থে এসেছে, নিম্নে আরবী অক্ষরের ক্রমানুযায়ী সে সব বইয়ের নাম পেশ করা হচ্ছে। যে সব পুস্তকে সংস্করণ, প্রকাশনা সংস্থার নাম লিখিত ছিল, সে সব পুস্তকে তা-ও উল্লেখ করে দেওয়া হল; কেননা পুস্তকগুলোর সংস্করণসমূহে পৃষ্ঠার কোন মিল নেই।

১। আল-আরবাঈন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯২০

২। ইযালাতুল আওহাম, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯০২

৩। আসমানী ফয়সালা, জিয়াউল ইসলাম প্রকাশনী, কাদিয়ান, ১৯১৭

৪। এ'জাযে আহমদী, ১৯০২

৫। আঞ্জামে আথম, ১৮৯৭

৬। আনওয়ারে খেলাফত, ১৯১৬

৭। আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯২৪

৮। এক গলতী কা ইযালাহ

৯। বারাহীনে আহমদিয়া, চতুর্থ সংস্কারণ, ১৯০৭

১০। বয়ানুল কুরআন : মৌলবী মুহাম্মদ আলী লাহোরী, প্রথম খণ্ড-১৯৪০, দ্বিতীয় খণ্ড-১৯৪১, তৃতীয় খণ্ড- ১৯৪২, প্রকাশনা সংস্থা করীমী প্রেস।

১১। পয়গামে সোল্হ, লাহোর

১২। তাবলীগে রেসালাত

১৩। তুহফাতুন নদওয়া, জিয়াউল ইসলাম প্রকাশনী, কাদিয়ান

১৪। তেরইয়াকুল কুলূব, জিয়াউল ইসলাম প্রকাশনী, কাদিয়ান

১৫। তাশহীযুল আযহান

১৬। তাওযীহে মারাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৯৭

১৭। হাকীকতুল ওহী, ১৯০৭

১৮। হাকীকতুন নবুয়ত, ১৯১৫

১৯। আল-হেকাম

২০। হায়াতে নাসের

২১। খুতবায়ে এলহামিয়া, ১৯০২

২২। দুররে ছামীন

২৩। রদ্দে তাকফীরে আহলে কেবলা, মকবুলে আম প্রেস, লাহোর ১৯২৬

২৪। রিভিউ অফ রেলিজেয

২৫। সুরায়ে চশমে আরিয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৮৮৬

২৬। সীরাতুল মাহদী, ১ম ও ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৩৫; ৩য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৯

২৭। শাহাদাতুল কুরআন, সেরন্দ প্রকাশনা, অমৃতসর

২৮। ফাতহে ইসলাম, ১৮৯৪

২৯। 'আল-ফযল' পত্রিকা

৩০। কিতাবুল বারিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৩২

৩১। কাশফুল এখতেলাফ, জিয়াউল ইসলাম প্রকাশনী, কাদিয়ান, ফেব্রুয়ারী ১৯২০

৩২। কালেমাতুল ফস্‌ল

৩৩। মিরকাতুল ইয়াকীন ফী হায়াতি নূরুদ্দীন, প্রকাশক- আঞ্জুমান এশাআতে ইসলাম, আহমদিয়া বিল্ডিংস, লাহোর

৩৪। মি'আরুল আখবার

৩৫। মকতুবাতে আহমদিয়া, পঞ্চম খণ্ড

৩৬। নাজমুল হুদা

৩৭। নুযুলুল মাসীহ, প্রথম সংস্কলণ, ১৯০৯

৩৮। নূরুল হক